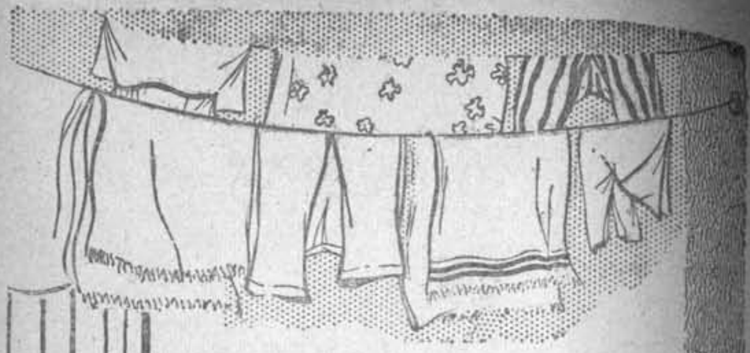


দাম : দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

১৩৬৭

পরিচয়







থেকে সহর গাঁয়েঁ

গত বছর যখন আমি নির্ম্মলাকে বিয়ে করেছিলাম আমার বাবা মাকে না জানিয়ে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুদিনের ভেতরেই অবশ্য তাঁরা এ ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে মেনে নিয়েছিলেন। বিয়ের প্রায় একবছর বাদে আমি আর নির্ম্মলা আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে গেলাম।

আমার মা নির্ম্মলার সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি ব্যবহারে খুব খুশী হলেন। সহরে শিক্ষিতা বৌ সংসারের কাজকর্ম্ম করবে না ভেবে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল সেটাও কেটে গেলো যখন নির্ম্মলা সংসারের সবকাজেই নিজে থেকে এগিয়ে গেলো। মা সবথেকে খুশী হতেন যখন সব মেয়ে বৌয়েরা নির্ম্মলাকে দেখতে আসতো আর নির্ম্মলা তাদের



নিয়ে বসে দেশবিদেশের পাঁচরকম গল্প শোনাতো। মা তাঁর শিক্ষিতা বৌ সম্বন্ধে খুবই গর্ব্বিত হলেন।

সবে গতকালই ও পাড়ার লক্ষ্মী মাকে বলছিলো "আমরা ভাবতাম লেখাপড়া শেখা মেয়েরা ঘর গেরস্থলীর কাজকর্ম্ম পারেনা কিন্তু তোমার বৌমা সেধরনের মেয়েই না।"



"কাজের কথাই যখন তুললে তখন শোন বৌমা সকাল থেকে কি করছে—রান্নাবান্না সেরেছে, ঘরদোর ঝাঁট দিয়েছে, জিনিষ পত্তর গোছগাছ করেছে, সেলাই নিয়ে বসেছে, দুটো চিঠি লিখেছে — এ সব সেরেও চান করতে যাওয়ার আগে এক-গাদা কাপড় কেচেছে" বলে মা দড়ীর ওপর টাঙ্গানো একরাশ কাপড় দেখালেন। লক্ষী কাপড়গুলো দেখে অবাক "ওঃ মা এসব তোমার বৌমার কাচা এমন কি বিছানার চাদর পর্য্যন্ত। কি রকম ধব্‌ধবে সাদা হয়েছে। আর আমি যখন কাপড় কাচি কাপড় থেকে ময়লা বার করতে আমার প্রানান্ত হয়। তবে হাজার হোক আমাদের নির্মলা হলো গিয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ে।"

নির্ম্মলা তখন চান সেরে বেরুছিলো আর লক্ষীর কথা কথা ওর কানে গেলো— "মাসীমা, এর সাথে লেখাপড়া শেখার কি যোগ আছে। ঠিক মতন সাবান ব্যবহার করলেই কাপড় পরিষ্কার হবে।"



"কি সাবান বাছা আমায় বলতো?" "কেন, সানলাইট সাবান, আপনি জনেন না?" লক্ষী তো অবাক্ "সত্যিই সানলাইট এত ভাল"। "নিশ্চয়ই—সানলাইট্ কাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কারণ অল্প একটু ঘষলেই প্রচুর ফেনা হয় যাতে সুতোর ভেতর থেকে ময়লার প্রতিটী কণা বার করে দেয়।

নির্ম্মলার কথা গুলো যেন সকলকে একটু দারুণ নতুন খবর জানালো। মা বললেন" এতে আরও সুবিধা যে এ সাবানে কাপড় আছড়াতে হয়না একদম—অল্প একটু ঘষলেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু খাটুনীই বাঁচেনা কাপডগুলোও বেশীদিন টেঁকে।"

"কিন্তু এ সাবানটার দাম বড় বেশী না কি?" এ প্রশ্নে মা চুপ করে গেলেও নির্ম্মলা বল্লো "সত্যি কথা বলতে এটা মোটেই বেশী খরচা পড়েনা—এতে এত ফেনা হয় যে এক গাদা কাপড় কাচা যায়। দেখুন টাঙ্গানো কাপড়গুলো—ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ২০টা কাপড় এগুলো সব কাচতে একটা সানলাইটের আধখানা লেগেছে। তবুও কি আপনি বলবেন বেশী খরচা পড়ে।"

লক্ষীর মুখে হাসিতে ভরে গেলো, ও বললো "বেঁচে থাকো মা, তোমার গুণের শেষ নেই। রোজ তোমার কাজ থেকে আমরা কত কিনা শিখেছি।"



হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।



সূচীপত্র

কার্তিক সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥
গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

... গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট ... মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

৩০ বর্ষ ; ৪র্থ সংখ্যা

কার্তিক, ১৮৮২ ; ১৩৬৭

প্রাচ্যবিদ্যার প্রাঙ্‌মুখী আয়োজন

গোপাল হালদার

শেষ পর্যন্ত মস্কোতে আবার এলাম।

'শেষ পর্যন্ত' কথাটা নিরর্থক নয়—যদিও সেই রবীন্দ্রনাথের পর থেকে আমরা যখনই যে রাশিয়ায় যাই, জানি, না গেলে এ জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। কারণ, রাশিয়ায় বা চীনে যখনি যাই বুঝতে পারি পৌছলাম আগামীর আঙিনায়—মনে মনে বলি, 'হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে'। যেখানেই এ প্রণাম নিবেদন করতে পারি সে স্থানই 'মহামানবের সাগর তীর', আমার কাছে 'ভারততীর্থ'। রুশিয়ায়ও যাই এই ভারতাদর্শ নিয়েই।

যাত্রা-পথ কোনো কালেই আমার পক্ষে অবাধ নয়, এবারও হয় নি। 'শেষ পর্যন্ত' কথাটা তাই স্বতঃই মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল—১০ আগস্ট, বুধবার, মস্কোর ঘড়ির সাড়ে দশটায়—আমাদের বেলা একটায়—যখন মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে বিমান থেকে মস্কোর মাটিতে পদার্পণ করলাম। মস্কোতে প্রাচ্যবিদ্যা-বিশ্ব-সম্মেলনের ২৫শ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেরও প্রথম বৈঠক তখন সমাপ্ত হচ্ছে। আমি যাচ্ছি সেই সম্মেলনেই যোগ দিতে—৯ই আগস্ট থেকে ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত তার অধিবেশন। সম্মেলনে পাঠের জন্য আমার নিবন্ধ যথা সময়ে প্রেরিত ও গৃহীত হয়ে আছে ; আমি অনুপস্থিত থাকলে অবশ্য তা পঠিত হবে না, পরিত্যক্ত বলেই বিবেচিত হবে। জানতাম না—১১ই-র প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিকেই ছিল তা পাঠের নির্দিষ্ট সময়—কাজেই ১০ই আমার না পৌছলেই নয়। উচিত ছিল ভারত থেকে ৮ই আগস্টের

বিমানেই মস্কো-যাত্রা। কারণ, ৬ই-র পরে বিমান এই ৯ই। ৬ তারিখের বিমানেই অধিকাংশ ভারতীয় প্রতিনিধিরা মস্কো যাচ্ছিলেন। তবে তাঁরা সকলেই ছিলেন, সরকারী বা নিম-সরকারী প্রতিনিধি, যাঁদের পূর্ণ বা অর্ধ ব্যয় ও ব্যবস্থাদির ভার গ্রহণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য-সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ। সেদিনের বিমানে আমার স্থান হয় নি। আমারই কর্ম-লেখা। না হলে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলাম অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমি প্রায় একই সময়ে—ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমি সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহ যথানিয়মে 'ছাড়পত্রের' জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু নিয়ম আমি পালন করলেই যে সব নিয়মিত রূপে নিষ্পন্ন হবে, এ আশা এবারও দেখলাম দুরাশা। মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন,—পুরো চারটি মাসের তাগিদের শেষে জুলাইর প্রারম্ভে উত্তর পেলাম—আমাকে ছাড়পত্র দেওয়া যায় না। আশা ছেড়েই নয়াদিল্লীর দুয়ারে আবার আপীল করলাম। দিন ১০।১৬ পরে জানানো হল,—'বেশ, ৬ মাসের শর্তে ছাড়পত্র পাবে, শুধু মস্কো পর্যন্ত। নিয়ে যাও।' কিন্তু তখন আর আমার স্ত্রীর পক্ষে ছাড়পত্রের অনুমোদন সম্ভব নয়; ওদিকে ৬ই আগস্টের বিমানেও তখন আমার স্থান লাভের আশা নেই। এমনকি, এত বিলম্বে কোনো যাত্রী-কোম্পানি আমার মস্কো-বাসের ব্যবস্থা ভার নিতে তখন চাইল না—সম্পূর্ণ নিজের খরচে শুধু নয়, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই আমাকে যেতে হবে সম্মেলনে। তাই দ্বিধার অন্ত ছিল না। নয়াদিল্লীতে পৌছেই আরও দেখলাম—সরকারী ও নিম-সরকারী ১২জন প্রতিনিধির নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত করে সরকার বলে দিয়েছেন—এরা ছাড়া যারা যাচ্ছে তারা নিজের ঝুঁকিতে যাচ্ছে, এবং তারা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সুযোগও পাবে না। এর পরে নিরস্ত হওয়াই সমুচিত। তবু ৯ই আগস্ট ভারতীয় বিমানে যাত্রা করলাম—সে বিমান মস্কো পৌছাবার কথা মস্কোর রাত্রি সাড়ে দশটায় অর্থাৎ আমাদের রাত্রি একটায়। অপরিচিত শহরে, ভাষা না-জানা মানুষের মধ্যে, আমার জন্য বন্দরে কেউ উপস্থিত না থাকলে আমি রিক্তহস্তে সেই রাত্রিতে, কী করব তা নিজেই জানতাম না। তার ওপর অর্ধেক পথ পৌছতে না পৌছতেই রাত্রি ৮টায় আমাদের বিমানের থামতে হল। কারণ, মস্কোতে ঝড়বৃষ্টি চলছে, রাত্রির মতো সেখানকার আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর বন্ধ। তাই এল নতুন বাধা। রাত্রিটা আখত্রিয়ান্স্ক নামক রুশিয়ার সীমানায়, কাজাকাস্তানের

একটি বড় শহরের বিমানবন্দরে কাটালাম। আরও বারো ঘণ্টা দেরি হল তাই মস্কো পৌছতেই। অতএব মস্কোর মাটিতে পা দিয়ে যে নিজেই নিজের মনে বললাম, 'শেষ পর্যন্ত এলাম তা হলে,' তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের পথ যে এত বাধায় আকীর্ণ, এত নিষেধে নিশিত—ক্ষুরস্য ধারা সমা—তা কিন্তু এর পরে আর একবারও স্মরণ করবার অবকাশ হয় নি। কারণ, মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বিমান-বন্দরের যাত্রীশালায় পৌছতেই দেখলাম দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন অনুজ-প্রতিম বন্ধু শ্রীমান ননী ভৌমিক, আর উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি অনুজা-সমা শ্রীমতী ভেরা নভিকভা। অক্লান্ত পরিশ্রমে নভিকভা আমার প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করলেন, ইউনিভার্সিটিতে 'সেকতর ঝা-র' আটতলার ৮১৪ নং ঘরে আমার আস্তানা ঠিক করে নিলেন; তারপর বুফে'তে আমাকে নিয়ে মধ্যাহ্নাহার শেষ করতে করতে বাজল চারটা, নিয়ে এলেন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্নের ভারতীয় শাখার অধিবেশনে—হিন্দী সাহিত্যিক ভাষার শব্দতত্ত্ব নিয়ে একটি নিবন্ধ পড়ছেন তখন তরুণ সোভিয়েত গবেষক বারখুদারফ। আমার সাধ্য হল না সে দিনের সেই শাখার আলোচনা শেষ পর্যন্ত শুনি—সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন করে তখন নামছে এতদিনের চাপা-পড়া উদ্বেগ-উত্তেজনার শ্রান্তি।

প্রাচ্যবিদ্যার জন্মপত্রিকা

ভারতীয়বিদ্যা শাখার ছিল দুটি উপশাখা; একটি শিল্প-সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের, অপরটি ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির। মস্কো বিশ্ববিদ্যায়ের দোতলায় কেন্দ্র-ভবনের মুখোমুখি দুটি বক্তৃতা-গৃহে দু উপশাখার অধিবেশন। সহজেই এক বক্তৃতা-গৃহ থেকে অন্য বক্তৃতা-গৃহে গতায়াত করা যায়। আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের তাতে সুবিধাই হল। অবশ্য ভারতবিদ্যার পক্ষে দুটি উপশাখা কিছুই নয়। কারণ, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক সকল যুগের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় জিজ্ঞাসাই এ বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু এটি প্রাচ্যবিদ্যার মহাসম্মেলন, শুধু ভারতবিদ্যার সম্মেলন নয়, ভারতবিদ্যা এর মোট ২০টি শাখার একটি শাখা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচ্য বলতে পৃথিবীর যে ভূভাগকে বুঝাতেন অন্ততঃ নানা মহাদেশ জুড়ে তার ভৌগোলিক এলাকা: গোটা এশিয়া ও জাপান, প্রভৃতি তার সন্নিহিত দ্বীপ সমূহ, এবং আফ্রিকার উত্তরাংশ। পণ্ডিতেরা

জানেন—এ ভূখণ্ড হচ্ছে সভ্যতার সূতিকাগার ; প্রাক্-ইতিহাস ও প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান অনেক কেন্দ্রই এর অন্তর্গত ; পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটেছে এ অঞ্চলেই। আর মঙ্গোল, সেম, আরব ও ইন্দোইউরোপীয় এই তিন মহাগোষ্ঠীর প্রধান বাসভূমি এ অঞ্চলে। তা ছাড়া, ছোট-বড়, মিশ্রিত আরও কত জাতির বাসভূমি যে প্রাচ্য তার হিসাব নৃবিজ্ঞানের। গ্রীস ও রোমকে ছেড়ে দিলে এসব গোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয়েই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্যন্ত মানুষের পরিচয়। মিশর, সুমের, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, চীন, ভারতবর্ষ,—এসব দেশের নামোচ্চারণেও আমরা বুঝতে পারি মানুষের সংস্কৃতির কী বিস্ময়কর বিচিত্র বিবর্তনই না প্রাচ্যবিদ্যার আলোচ্য। আধুনিক যুগের সভ্যতার বাহন হতে গিয়ে পশ্চিম-ইউরোপের মানুষ এই প্রাচ্যমণ্ডলে যখন উপস্থিত হল তখন এল প্রধানতঃ বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের লোভে। খ্রীষ্টধর্ম প্রসারের উত্তেজনাও না ছিল তা নয়। বণিক-ধনিকতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল প্রাচ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন ও মানব-গোষ্ঠীকে শোষণ—তার আনুষঙ্গিক হিসাবে ছিল প্রাচ্যমণ্ডলের সম্বন্ধে চিরদিনের বিস্ময়। আরবদের মধ্যেও মধ্যযুগে পৃথিবীর সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ কৌতূহল ছিল ; বুর্জোয়া যুগে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও আলোচনার পদ্ধতিতে মানববিদ্যার নূতন শাখায় পরিণত হল ; আর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তার ধারকরূপে প্রাচ্যমণ্ডলে দেখা দিলেন। এভাবেই ক্রমশঃ প্রাচ্যবিদ্যার গোড়াপত্তন হয়। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে তার নাড়ির টান জন্ম থেকে, তবু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তা উজ্জ্বল।

কলকাতাতে আমরা এই প্রাচ্যবিদ্যার সুস্পষ্ট সূচনা দেখেছি ১৭৮৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠায়। প্রাচ্যবিদ্যার এই বিশ্বসম্মেলনের কিন্তু আয়োজন হয় আরও প্রায় একশত বৎসর পরে—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন প্রথম অধিবেশন হয় প্যারিসে, দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৭৪-এ লণ্ডনে। আর তৃতীয় অধিবেশন রুশিয়ায়, ১৮৭৬-এ সেদিনের সেণ্ট পিটার্সবার্গে, আজ লেনিনগ্রাদে। মজার কথা জানা গেল, সে-অধিবেশনে সেদিনের মিনায়েফ প্রভৃতি রুশ ভারতবিদরা যোগদান করেন নি—তখন রুশ আকাদেমির সদস্যদের পক্ষে জারের আমলা-তন্ত্রের আধিপত্য আপত্তির হয়ে উঠেছিল। সেই তৃতীয় অধিবেশনের ৮৪ বৎসর পরে এবার আবার রুশিয়ায় এই বিশ্বসম্মেলনের অধিবেশন—মাঝখানে দু-তিন বৎসর পর পর

হয়েছে বিশ্বসম্মেলনের অধিবেশন। দুটি বিশ্বযুদ্ধে দুবারের মতো বিশ্বসম্মেলনেরও বেশ কিছুদিন নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে, তা না বললেও চলে। একবার আলজিয়ার্সে ও একবার স্তানবুলেও অধিবেশন হয়েছিল। কিন্তু এপর্যন্ত এশিয়ায় হয় নি—প্রাচ্য দেশের রাজনীতিক-সামাজিক অবস্থাও তেমন ছিল না। শেষ অধিবেশন হয় মিউনিখ-এ। তখন সোভিয়েত পণ্ডিতেরা আহ্বান জানান। এই ২৫শ অধিবেশনে যে মহাসমারোহ হবে তা বুঝা গিয়েছিল। তাই তার স্থান আর লেনিনগ্রাদে হল না, মস্কোর লেনিন-পাহাড়ের নবনির্মিত বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নির্দিষ্ট হয়েছে—এত জায়গা, বক্তৃতাগৃহ, সুব্যবস্থা আর ওদেশে কোথাও সম্ভব নয়।

সেবার (১৯৫৮) দেখেছিলাম—স্লাভিস্ত কংগ্রেস ও ভূপদার্থ-বিদ্যার কংগ্রেস প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন সমূহ সোভিয়েত-কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আহ্বান করেন। করবার মতো জায়গা বটে। এ তো শুধু ৩০ তলার বিরাট প্রাসাদ নয়, একটা শহর। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বহু শাখার অধিবেশন ও অধিকাংশ প্রতিনিধির জন্য এখন সস্তায় আবাস ও আহারাদির ব্যবস্থাও হয়েছে। যাঁরা সস্ত্রীক এসেছেন তাঁরা অনেকে অবশ্য আছেন উক্রেনিয়া হোটেলে। প্রতিনিধিরা অনেকেই এখানে উঠেছেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ গৌরী শাস্ত্রীর মতো স্বপাকাহারীদের সম্ভবত না হলে অসুবিধাই হত। কারণ, হোটেলে স্বপাকে বিপাক ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে এক-একটি খণ্ডের (Sector) এক-একটি তলায় ছাত্রদের জন্য একটি করে প্রকাণ্ড আধুনিক ধরনের রন্ধন-গৃহ আছে—ছাত্ররা নিজেরা তাতে খুশিমতো রান্না করতে পারেন ; আর আছে একটি করে প্রকাণ্ড ধোবিখানা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাত্ররা তাতে নিজের নিজের বস্ত্র ধৌত ও ইস্ত্রি করে নিতে পারেন। স্বাবলম্বী ও স্বপাকীদের অসুবিধা নেই। আমরা অবশ্য প্রতিনিধিরূপে কুপন কেটে খুশিমতো আহার করতাম —বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ভোজনশালায়। ছাত্রদের ভোজনশালায় ছাত্ররা নিজেরা খাদ্যাদি নিয়ে নেয় ; তাতে শুনেছি সেখানে ভিড় বেশী, দেরি হয় ; মোটামুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্য-পানীয় সস্তা, আর ঘরভাড়াও কম। সুনীতিবাবু সস্ত্রীক পূর্বেই ইউরোপ ঘুরে মস্কো এসেছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন হোটেলে। ভারতীয় অন্য প্রতিনিধিরা দু-একজন

বাইরেও ছিলেন। নাহলে ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি অন্যান্য সকলেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে—হোটেলের ব্যয়ভার বহন কারও পক্ষেই নিজের পুরো বা আধা-খরচে খুব সুখকর নয়। কারণ পুরো খরচ পেয়েছেন মাত্র চারজন। অনেকে তো ইচ্ছা থাকলেও এজন্য আসতে পারেন নি—আমার মতো দুঃসাহস সকলের হয় না।

প্রতিনিধি, প্রবন্ধ

সবশুদ্ধ ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন প্রায় ৪০ জন। মিউনিখ অধিবেশনে মোট ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন ১৯ জন—এ তথ্য দেখা যায় সে সম্মেলনের রিপোর্টে। ভারতবিদ্যায় দু-শাখায় গড়ে শত দেড়েক পণ্ডিত যোগদান করতেন। অনেকে সোভিয়েত দেশীয়। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অধিবাসীও ছিলেন, সেসব দেশ থেকেও দু-একজন ভারতীয় বিদ্বান এসেছিলেন। যেমন, বার্লিন থেকে এসেছিলেন একজন বাঙালী ভাষাবৈজ্ঞানিক ; ব্রিটেনের ভারতবিদদের সঙ্গে এসেছিলেন পাটনার অধ্যাপক ডাঃ রামশরণ শর্মা ; অবশ্য এছাড়া ব্রিটেনের প্রতিনিধিমণ্ডলীতে ছিলেন ডাক্তার বাশম্, আর একসময়ে কলকাতা-প্রবাসী জন আরুইন্ ও মিসেস আরুইন্। অবশ্য প্রায় ৬০টি দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছেন এক হাজার পণ্ডিত, আর অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আরও এক হাজার প্রাচ্যবিদ। মোট প্রায় ৭০০ প্রবন্ধ সম্মেলনে গৃহীত হয়, তার মধ্যে প্রায় ৮০টি ভারতবর্ষ সম্পর্কিত। তার প্রায় ৫০টি পঠিত হয় ; কারণ অনেক লেখক উপস্থিত হতে পারেন নি। যেমন আসেন নি দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কে. এম.আশরাফ। তাঁর নিবন্ধে বিষয় ছিল 'ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ'—বারেবারে সম্মেলনের সভ্যরা জিজ্ঞাসা করছিলেন 'ডাঃ আশরাফ আসেন নি ?' যেসব প্রবন্ধ নিয়ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত তা নিয়মমাফিক এপ্রিল মাসে প্রেরণ করার কথা—আমি তা পাঠিয়েছিলাম, মোট তিনটি নিবন্ধ। কিন্তু তখন পর্যন্ত ভারতসরকার নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন নি। তাই সরকারী প্রতিনিধিদের সময় মতো প্রবন্ধ পাঠাবার কথা নয়। আর আমার মতো নিমন্ত্রিতদের ছাড়পত্রেরও নিশ্চয়তা ছিল না—নিবন্ধ পাঠিয়েই বা কি হবে ? অবশ্য এপ্রিলের পরেও সোভিয়েত উদ্যোক্তারা অনেককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—যেমন, কলকাতায় ডাঃ মহাদেব সাহাকে,

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাও এদিকে ত্রুটিহীন নয়। তবে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তাঁরা সেখানে ভাষণ দেবার ও নিবন্ধ পড়বার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে নিয়মের অত্যাচার হয় নি—তা উচিতই হয়েছে।

ভারতবিদ্যার শাখা-দুটি সম্মেলনে অনেককেই আকৃষ্ট করে। তার প্রতিনিধিরাও সমাদৃত হন। ভারতীয়দের মুখপাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য, অমায়িকতা ও চরিত্রশক্তি এ শাখার গৌরব বর্ধন করে। মস্কোতে 'ইন্দিস্কির' সমাদর সর্বত্র।

নূতন দিগন্ত

মস্কো অধিবেশনে বিশটি শাখার আয়োজন হয়েছিল—ভারত, চীন, মিশর, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের নামে ছাড়া, দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, বাল্কীয়া, দক্ষিণপ্রাচ্য, এশিয়া প্রভৃতি ব্যাপক অঞ্চলের নামেও প্রয়োজন মতো এক-একটি শাখার ব্যবস্থা হয়েছে। চীনাবিদ্যার শাখা এবার জমে নি। যে কারণেই হোক, নতুন চীনের পণ্ডিতেরা আসেন নি, এটি নৈরাশ্যের এক কারণ। কিন্তু অন্যদিকে মস্কোতেই এবার একটি নতুন শাখারও সূচনা হয়েছে—আফ্রিকীয় বিদ্যার শাখা, এইটি মস্কো অধিবেশনের প্রধান গৌরব। প্রাচীন মিশর ও আরবীয় জগতের বাইরে যে 'কৃষ্ণ আফ্রিকা', প্রাচ্যভূমির সঙ্গেই তার আত্মীয়তা, এই বোধ যেমন এই ব্যাপারে দেখা গেল ; তেমনি বুঝা গেল—ইতিহাসের আসরে কৃষ্ণ আফ্রিকার জাতিরা এবার পদার্পণ করছে—মহাদেশের বিচিত্র বিদ্যার আলোচনার গোড়াপত্তন হচ্ছে। এও খুবই স্বাভাবিক যে, এই কৃষ্ণ মহাজাতির বিদ্বৎ-সমাজে স্বীকৃতি ও মানব মহাযাত্রায় যোগদানের ঘোষণা এভাবে উত্থিত হল মস্কোর এই ক্ষেত্র থেকে—ইতিহাস যেন মস্কোকেই দিয়েছে এই পরম ঘোষণার গৌরব। 'ভাবীকালকে আমরা দেখি না। কিন্তু তার আঙিনাতেই কি এসে যাই নি ?' এ প্রশ্ন মস্কোতে নিজেকে করেছি এমন এক-একটি সূত্রে। আমার পক্ষে অবশ্য কৃষ্ণ আফ্রিকা শুধু অজ্ঞাত আশার রাজ্য ; তার কোনো তথ্যই আমার পরিজ্ঞাত নয়। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসু—তাঁর 'আফ্রিকানিজিম্' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে আফ্রিকার সঙ্গে কিছু পরিচয়

আমারও হয়েছে। আর আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল 'কৃষ্ণ-আফ্রিকার' সাহিত্যিকদের সঙ্গে দুই বৎসর পূর্বে (১৯৫৮ অক্টোবর) তাশখন্দে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে। মস্কোতে আমি উন্মুখ হয়ে গিয়েছিলাম—সেই বন্ধুদের কারও কারও সাক্ষাৎ পাব, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় আরও একটু প্রসারিত হবে, ভাবীকালের মুখচ্ছবি আরও একটু হবে স্পষ্টতর রেখায় প্রতিভাত। সে আশা কিন্তু বেশী সফল হয় নি। সমগ্র আফ্রিকার প্রায় ২০টি স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি এ সম্মেলনে এসেছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ বৈষয়িক কারণেই কৃষ্ণ আফ্রিকার সাহিত্যিকরা বেশী সংখ্যায় আসতে পারেন নি—আমার পূর্বপরিচিতদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্যামেরুন-এর, একজন কোনাকৃবির। তাছাড়া নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিও ছিলেন। মিশর, সুদান, আবিসিনীয়া ও আরব্য মণ্ডলের আফ্রিকার প্রতিনিধি ছিলেন অনেকে। নতুন 'আফ্রিকা' শাখায় প্রধানতঃ উপস্থিত ছিলেন এখনো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাই—দু-একজন জাপানী-চীনা পণ্ডিতও না ছিলেন তা নয়। এ শাখার অধিবেশনগৃহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়-পাড়ার জ্যোতির্বিদ্যার বীক্ষণাগারে। ভারতবর্ষ থেকে একদিন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় সেখানে তাঁর ভাষণ দিলেন—আগ্রহের বশে আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম। সে ভাষণ উপস্থিত পণ্ডিতদের সুখ্যাতি লাভ করেছে। বিশেষ করে এ উপলক্ষে তিনি ভারতীয় মানুষের পক্ষ থেকে আফ্রিকার মানুষকে জানালেন এই প্রাচ্যবিদ্যার আসরে সুস্বাগতম্—আর এইটিই সর্বাধিক গুরুতর কথা। কারণ, তিনিই ভারতীয় প্রতিনিধিদের মুখপাত্র ; আর এই অধিবেশনে এই স্বাগত-সম্ভাষণের সুযোগ ভারতবর্ষ অবহেলা করলে ইতিহাসের হিসাবে তা হত মহাপাতক। আমি তো বিশেষ করে আমার যাত্রা সার্থক মনে করি যে, অন্ততঃ একটি বেলার জন্যও আমি আফ্রিকীয় শাখায় উপস্থিত হয়েছি।

এ প্রসঙ্গেই মনে হয়—ভারতবর্ষে আফ্রিকীয় বিদ্যা-গবেষণার গোড়াপত্তন করাও এখন আবশ্যক। ভারতীয় পণ্ডিতদের গবেষণা ভারত ও কতকাংশে বৃহত্তর ভারতেই এখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিংবা, আরব ও পারস্য বিদ্যার প্রান্ত পর্যন্তও তা স্পর্শ করে। অবশ্য মস্কোর অধিবেশনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আরেকটি ভাষণ দিয়েছিলেন—অন্য এক শাখায়। ভারত শাখায় তিনিই মূল সভাপতি, সেখানে তিনি 'প্রাচীন ভারতের উপরে চীনা সংস্কৃতির প্রভাব'

সম্বন্ধে প্রথম দিনই এক সুদীর্ঘ তথ্যবহুল ভাষণ দেন, এ বিষয়ে মূল নিবন্ধটি শীঘ্রই এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হবে। ককেশীয় শাখায় তিনি পড়েছিলেন 'আর্মানী বীর-গাথা' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ-সার—তা সম্ভবতঃ প্রকাশিত হবে অন্যত্র। এই নিবন্ধও আমার শোনা সম্ভব হয় নি। কারণ আমি মস্কোয় পৌছেছিলাম সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে।

কাগ্রেস

সম্মেলনের উদ্বোধন দেখা আমার ভাগ্যে সম্ভব হয় নি। ৯ই আগস্ট সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সভাগৃহে সে-অনুষ্ঠান হয়। বিশ্বসম্মেলনের প্রথা অনুযায়ী তা উদ্বোধন করেন গত মিউনিখ অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক এর্নেস্ট ভাল্‌দ্‌স্মিদ্,—তিনি ভারতেও সুপরিচিত। তাঁর হাত থেকে এই ২৫শ কংগ্রেসের সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করলেন বাবাজান গফুরফ। সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্যার তিনি অধ্যক্ষ, বিজ্ঞান আকাদেমির করেসপণ্ডিং মেম্বর (সহ-সদস্য ?)। গফুরফ সোভিয়েত তাজিকিস্তানের লোক, আর ফার্সি তাঁর মাতৃভাষা,—ভারতবাসীদের প্রতিবেশীই তাঁকে বলা যায়। গোলগাল নাতিদীর্ঘ এই প্রৌঢ় মানুষটিকে ভারতবর্ষে অনেকে দেখেছেন। আমি এবার দেখেছি —স্ত্রী-কন্যা সহ, মুখে একটু স্মিত হাস্য রেখা। তারপর সোভিয়েত মন্ত্রী-পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মেলনকে স্বাগত করলেন আনাস্তাস মিকোইয়ান। তিনি বোধহয় নিজেও প্রাচ্য-দেশীয়, জাতিতে সম্ভবতঃ আর্মানী। প্রাচ্যবিদ্যার এই পণ্ডিত-সভায় একটা নতুন সুর তিনি সঞ্চার করলেন। নতুন প্রাচ্য জন্ম নিচ্ছে—প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার চরিত্রে ও আলোচ্য বিষয়েও সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে। যে প্রাচ্যমানুষ এতদিন ছিল আলোচ্য বিষয়ের উপাদান মাত্র, তারাই এখন সে-বিজ্ঞানের স্রষ্টা। প্রাচ্যবিদ্যার চর্চায় আর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মালিকানা খাটবে না। এ বিদ্যার চর্চা সার্থক হবে যখন প্রাচ্যদেশগুলির জনগণের জীবনের সঙ্গে তা যুক্ত হবে। এখন থেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমানাধিকারের ভিত্তিতে পণ্ডিতদের সহযোগিতা স্থাপিত হল। মিকোইয়ান রাজনৈতিক নেতা—তিনি সে দৃষ্টিভঙ্গিতেই সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন : প্রাচ্যের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, সকলের স্বাধিকার সম্পন্ন মৈত্রী, এই তাদের কাম্য। আমিও মনে

করি, মস্কো সম্মেলন প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচ্য পণ্ডিতদের আত্মপ্রতিষ্ঠার রচনা করেছে—এইটি সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রধান গৌরব।

মিঃ মিকোইয়ানের পরে মস্কোর মেয়র, সোভিয়েত আকাদেমির প্রতি-সভাপতি (মিঃ ওস্ত্রোভিতিয়ানফ), রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি-জেনারেলের প্রতিনিধি ও মস্কো-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর (অধ্যাপক সোকোলফ) একে একে সম্মেলনের প্রতিনিধি ও অতিথিদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এর পরে সভাপতি গফুরফ মহাশয়ের অভিভাষণ—তাতেই সে-বেলার সভা শেষ। অপরাহ্নে বিভিন্ন শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয় ৪টা থেকে। ভারত শাখার মুখ্য-অধিবেশনে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হলেন সভাপতি, আর, তাঁর অভিভাষণের বিষয়—'ভারতীয় সংস্কৃতিতে চীনের প্রভাব।' তারপরে ভারত-শাখা দু উপশাখায় ভাগ হয়ে মুখোমুখি দুটি বক্তৃতা-গৃহে বসতে থাকে—এক-এক সময়ে এক-এক জন প্রধান পণ্ডিত তাতে সভাপতির কাজ চালান। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধ ছাড়া যে সব ভারতীয় নিবন্ধ বা ভাষণ বিশেষভাবে আলোচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্ন-বিভাগের অধ্যক্ষ অমলানন্দ ঘোষ মহাশয়ের আলোচনা—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গঠনে কোন্ কোন্ জাতি অংশগ্রহণ করেছে, তাতে তা আলোচিত হয়। ডাক্তার নিজামুদ্দীন আলোচনা করেন অল বিরুনীর দানের কথা। ডাঃ রামশরণ শর্মার আলোচ্য ছিল ভারতের ভূমিসত্ব; তিনি গবেষকের সমস্যা ও উপাদানের জটিলতার দিকটি তুলে ধরেন। শ্রীযুক্ত দাণ্ডেকার ভারতে গত তিন বৎসরের ভারতবিদ্যার চর্চার বিবরণ উত্থাপন করেন। অধ্যাপক গৌরী শাস্ত্রী মধ্যযুগের বাঙলায় সংস্কৃত চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায় ও তিনি বহু বিষয়ে আলোচনাতেই সোৎসাহে যোগদান করেছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও ডাঃ কালিদাস নাগও ছিলেন তেমনি আলোচনায় উৎসাহী। তাঁর বিশেষ আলোচ্য ছিল 'দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব'। তামিল অধ্যাপক চেট্টিয়ার প্রাচীন তামিল 'কুরলের' সম্বন্ধে নিবন্ধ পাঠ করেন। আধুনিক ভারতীয় বিদ্যায় ভারতীয়দের নিবন্ধ ছিল—আলিগড়ের অধ্যাপক ডাক্তার সরুর সাহেবের 'স্বাধীনতার পরবর্তী উর্দু সাহিত্য', শিবদান সিংহ চৌহানের 'ভারতনাট্য শাস্ত্রের প্রভাব', (চৌহান মহাশয় হিন্দীতে সোভিয়েত যুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য সস্ত্রীক মস্কোতেই ছিলেন, এখনো আছেন—প্রসঙ্গক্রমে তা বলা দরকার)

কে. এম. জর্জের দ্রাবিড় ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ। বাঙলা সাহিত্য নিয়েও আলোচনা কম হয় নি। কালিদাসবাবু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, শান্তিনিকেতনের গবেষক তরুণ মার্কিন অধ্যাপক এন. হে 'রবীন্দ্রনাথের ঋষিবাণী' সম্পর্কে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন,—তা নিয়ে বিতর্কও হয়। আমরাও রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে প্রাচ্যবিদদের আমন্ত্রণ জানাই। আসলে একদিন (১১ই) সকাল বেলার অধিবেশন তো বাঙলা সাহিত্যই প্রায় অধিকার করে নেয়—সেদিন আমাকে পড়তে হয় আমার নিবন্ধ ঊনবিংশ শতকের বাঙলা ঐতিহাসিক রোমান্স সম্বন্ধে, শ্রীযুক্তা নভিকভা পড়েন তাঁর নিবন্ধ সেই শতকের স্বদেশপ্রীতির কবিতা সম্বন্ধে। কালিদাস-বাবুও দেন তাঁর বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে।

বাঙলা চর্চা

হয়তো বাঙলার আলোচনা সম্পর্কে আরও একটু বিবরণ দেওয়া সমীচীন। এন. হে-র নিবন্ধটির কথাই প্রথম বলি। তাঁর নিবন্ধ নিয়ে বিতর্ক হয়। হে-র প্রতিপাদ্য ছিল এই—রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার পার্থক্য ও বৈপরীত্য দেখিয়ে প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাণীর মহত্ত্ব ঘোষণা করেছেন এবং এই বাণীর ('মেসেজ') ঋষি (? প্রোফেট্)রূপেই তিনি পাশ্চাত্ত্য-সমাজে পরিচিত ও আদৃত। এ উক্তির পক্ষে নিবন্ধকার যুক্তি দেন—রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের লেখা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পার্থক্য বিষয়ে নানা মন্তব্য ও প্রবন্ধ থেকে, উদ্ধৃতি থেকে। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ বিচারে কবির প্রথম জীবনের লেখা সেসব মন্তব্য ও প্রবন্ধ যে গৌণ তা আমরা জানি ; বিশেষত সমসাময়িক নানা আলোচনার পটভূমিকা থেকে তা বিচ্ছিন্ন করে দেখাও ভুল। এ ভুল হে মহাশয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিগুলো মিথ্যা উদ্ধৃতি নয় ; তার এরূপ বিচার মূলতঃ ভ্রান্ত, সিদ্ধান্তও তাই বিভ্রান্তিকর। ইউরোপের কারও কারও চোখে 'গীতাঞ্জলী'র রবীন্দ্রনাথ প্রোফেট হয়ে উঠছিলেন। তাঁদের মোহ শুনেছি রবীন্দ্রনাথই ভেঙে দেন।—প্রথমতঃ কবীরের দোঁহাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করে তিনি নাকি বুঝিয়ে দেন ওরকম রহস্যবাদের তিনিই উৎস নন, উৎস ভারতীয় সাধক-পরম্পরা। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে একেবারে 'সভ্যতার সঙ্কট' পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কবি যে বাণী অক্লান্তভাবে প্রচার করেন তাতে একদিকে আছে মানবতার বাণী ;

আর অন্যদিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে মানুষের সংস্কৃতির একীভূত গঠনের প্রয়াস। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিচ্ছেদ-বিরোধের ভাবুক, অন্যদিকে (মানবতা-হীন?) আকাশচারী আধ্যাত্মিকতার প্রোফেট, মার্কিন যুবকের মুখ থেকে এই মর্মের কথা শুনে আমরা মৃদুহাস্য করেছি—তাঁদের প্রতিপাদ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সোভিয়েত প্রাচ্যবিদরা এই মার্কিনী 'অপচেষ্টা' ক্ষমা করতে চান নি। ঐতিহাসিক গোলদবের্গ শান্ত প্রবীণ পণ্ডিত ভারত ইতিহাসের গবেষক। প্রথমেই তিনি স্বল্প কথায় জানিয়ে দিলেন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে পরস্পর বিরোধী বলে এভাবে দেখানো ভুল—ওরূপ ভেদরেখা কাল্পনিক, কবি রবীন্দ্রনাথ ওরূপ ভেদ মানতেন না। হিন্দী ভাষাবিদ্ চেলিশেফ্ একটু জোর দিয়েই বললেন—এভাবে কবিকে নিছক অধ্যাত্মবাদের কবি বলে দেখা ভুল, পশ্চিমে কেউ তাঁকে সে ভাবে দেখে না—তিনি শিক্ষাগুরু, সমাজ-সংস্কারক, জাতীয় স্বাধীনতারও কবি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানব-মুক্তির কবি, শান্তির ও বিশ্ব-মৈত্রীরও কবি। ডাঃ কালিদাস নাগও তাঁর মন্তব্যে এই কথায় জোর দেন। উত্তরে অধ্যাপক হে আর নতুন যুক্তি দিতে পারেন নি, শুধু জানালেন —তার প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে একটু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে; এবং তিনি নিজে যা বলেছেন, বলেছেন রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে, তাতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ওরূপ তুলনা আছে। বিতর্ক যাই হোক, দেখেছি রবীন্দ্রনাথের মূল বাণী সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্‌দের মধ্যে বিভ্রান্তি নেই, আর আধুনিক প্রাচ্যের তিনি যে মহৎ পুরুষ, মানবতার উদ্‌গাতা,—এ মর্মের কথাও সম্মেলনে বারেবারেই উঠেছে।

আমার ও শ্রীমতী নভিকভার প্রবন্ধ ছিল অনেকটা একই বিষয় নিয়ে। আমি অবশ্য অন্য দুটি নিবন্ধও পাঠিয়েছিলাম—একটি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে, অন্যটি 'ইয়ং বেঙ্গলের' সম্বন্ধে। কিন্তু সম্মেলনে একটির বেশী প্রবন্ধ গ্রাহ্য না। কোন নিবন্ধটি যে গ্রাহ্য হয়েছে তা আমি মস্কো পৌঁছে জানলাম—'বাঙলা ঐতিহাসিক রোমান্সের' স্বরূপ-ব্যাখ্যা। আমি একটা ধারণা দূর করতে চেয়েছিলাম—রোমান্স মাত্রই যে পলায়নী-বৃত্তির প্রমাণ তা নয়। বঙ্কিম প্রভৃতির ঐতিহাসিক রোমান্সের উদ্দেশ্য ছিল বরং ইতিহাসের মধ্য থেকে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা সংগ্রহ করে, জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা এবং বৈদেশিক রাজরোষ উদ্রেক না করে 'ধোঁয়ার ছল করে কাঁদা'। দৃষ্টান্ত দিয়ে

কথাটা বিশদ করার মত সময় তো ছিল না, তাই সংক্ষেপেই সব বলতে হল। আলোচনায় আপত্তি হল না, ডাঃ কালিদাস নাগ তার পুরনো ছাত্রকে 'কমরেড হালদার' বলে উল্লেখ করে প্রশংসা করলেন, লজ্জাও দিলেন। তবে সেদিন সে শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ভালতার রুবেন। ভারতবর্ষেও তিনি অপরিচিত নন; সংস্কৃত জানা জার্মান ভারতবিদ্। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় কিন্তু মস্কোর বিমান বন্দরে—বার্লিনের হুমবোল্‌দ্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের তিনি প্রধান একজন পরিচালক। হিটলারী যুগে মার্কিন দেশে তাঁকে ঠাঁই নিতে হয়েছিল, তারপরে ফিরে এসেছেন ইউরোপে। বার্লিন থেকে বিমানে আসতে পূর্বরাত্রে তিনিও মস্কোতে নামতে পারেন নি—বিমান গিয়ে অপেক্ষা করেছিল সে রাত্রে লেনিনগ্রাদে, আর আমাদের মতোই পৌঁছালেন ১০ই তারিখের মধ্যাহ্নে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছেলে টেকনোলজির ছাত্র, তিনিও পুত্রের প্রতিবেশী, আর আমাদেরও প্রতিবেশী। শালপ্রাংশু, ব্যূঢ়োরস্ক মহাভুজ এই জার্মান পণ্ডিতের কথা আরও বলতে পারলে খুশী হতাম,—দেখেই আনন্দিত হতে হয়েছে। প্রসন্ন ব্যবহার, সরস ও স্বচ্ছন্দ কথাবার্তা ও জিজ্ঞাসায় তাঁর পরে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। শুনেছিলাম রুবেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও অনুবাদে পড়েছেন। কিন্তু আলোচনার শেষে তিনি একটি কথা বললেন, যাতে বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য রোমান্টিসজম-এর মধ্যে একটা ধারা ইতালির জাতীয়তাবাদেরও প্রেরণা জোগায়—যার প্রতিভূ হন মাৎসিনি গ্যারিবল্‌দী। মাৎসিনির নাম ভারতবর্ষেও অপরিচিত ছিল না। বাঙলা সাহিত্যের রোমান্টিক ধারার তুলনা হয়তো সেই ইতালীয় রোমান্টিক ধারার সঙ্গেই করা চলে—তা 'পলায়নী বৃত্তি' নয়, দেশপ্রীতিরই পরিপোষক। এর পরে শ্রীমতী নভিকভার প্রবন্ধ যেন এ কথারই সমর্থন বলে মনে হল—অনেক উদ্ধৃতি তাতে ছিল। মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের কৃপায় সম্মেলন ক্ষেত্রে বাঙলার আলোচনা যথেষ্ট জমেছে তা গুরুত্বও লাভ করেছে।

একটা কথা বোঝা যায়—বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিদেশেও ভারতবিদ্ পণ্ডিতদের আসরে বা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনার সাহিত্যের আসরে প্রধান। কিন্তু রাজনৈতিকদের প্রয়োজনে-নির্দেশে রাজনৈতিকদের আসরে তা খর্বিত—কি স্বদেশে, কি বিদেশে। মস্কোতেও তা টের পাওয়া যায়। এক সময়ে সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীদের চোখে

বাঙলা, হিন্দী ও উর্দু ছিল সমতুল্য, প্রধান তিন ভারতীয় ভাষা। আজ নয়াদিল্লীর লিখিত ও অলিখিত নিয়মে হিন্দীই ভারতের বাইরে 'রাষ্ট্র-ভাষা'রূপে প্রচারিত। ওসব দেশে যাঁরা সাহিত্যের সমঝদার—নিতান্তই সাহিত্য-বায়ুগ্রস্ত—তাঁরাই শুধু বাঙলা পড়তে উৎসাহী। কূটনীতি রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণ আলাপ-আলোচনার জন্য যারা ভারতীয় ভাষা শিখতে চান তাঁদের নিকট হিন্দীর প্রাধান্য অবিসংবাদিত। আর সর্বদেশে এ সব কারণেই তো ছাত্ররা বিদেশীয় ভাষা শেখেন। সাহিত্যের জন্য বিদেশী ভাষা শিখতে হলে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ছেড়ে বাঙলা শিখবে কয়টি পাগলে? মস্কোতে পাগলের সংখ্যা বেশী নেই। বাঙলার ছাত্র সেখানে কমছে, হিন্দীর ছাত্রও ক্রম-বর্ধমান। নয়াদিল্লীর বাদশাহী ব্যবস্থা ছাড়াও এ জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য অন্যান্য রাজনৈতিক মানুষের এবং হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা-ভাষীদের কারও কারও নিরঙ্কুশ প্রচারের (আত্মভাষার মহিমা প্রচার আসলে bye-product, তাদের মুখ্য লক্ষ্য আত্মপ্রচার)। একে তো সংখ্যার মারে আমরা বিচ্ছিন্ন, তাতে আবার রাজার মারে, প্রচারের মারে—এই প্রচার-প্রধান যুগে—আমরা আরও বিপন্ন। স্বদেশেই কি ঠাঁই আছে? প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের অভিজ্ঞতায় এবং তৎপর সোভিয়েত-বাসের কালে এ সূত্রে দুটি-একটি কথা মনে হয়েছে :—আসামই মারুক কি দিল্লীই মারুক, ঘরের মধ্যে আমরা না মরতে চাইলে কে আমাদের মারে? কারণ, এই সাত কোটি (বা তিন কোটি) মানুষের ভাষা বাঙলা ফরাসী ভাষার থেকে তো সংখ্যায় ছোট নয়; আর এই রবীন্দ্রনাথের ভাষাও সাহিত্য-মর্যাদায় খাটো নয়। দ্বিতীয় কথা, ভারতবিদ্যার আলোচনা সভায় দেখেছি—রুশ, জার্মান, ফরাসী নানা ভাষাতে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু ভারতবিদ্যার পক্ষে স্বভাষা যেন ইংরেজী;—রুশ, জার্মান, ফরাসী কোনো পণ্ডিতেরই তাতে কুণ্ঠা নেই। উচ্চশিক্ষাও মাতৃভাষাতে হোক এ আমরা চাই; কিন্তু দেখছি উচ্চশিক্ষিতের হিন্দীতে তত দরকার নেই যত দরকার ইংরেজী ভাষাতে। একজন ভারতীয় বিদুষীকে দেখেছিলাম সম্মেলনে—হিন্দী তাঁর মাতৃভাষা—পতিভাষা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর। তাঁর নিবন্ধ কালিদাস সম্বন্ধে, তা লেখা ও পড়া হল ইংরেজীতে, আলোচনাও সেই ভাষাতেই সম্পূর্ণ হল। ক্রেমলিনের ভোজসভায় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন ভাষণদানে আহূত হলেন তিনিই প্রস্তাব করলেন—'আপ হিন্দীমে বলিয়ে।' ও রকমের মিলন-সভায় দশ আনা লোক ইংরেজী বোঝে; হিন্দী বোধ হয়

ভারতবাসী ছাড়া দশজনও বোঝে না। কিন্তু সেই হিন্দী বলে (কিংবা বাঙলা বলে), তার অনুবাদে (অন্তত রুশ অনুবাদ) দ্বিগুণ সময় ক্ষেপণ করে, সভায় রসভঙ্গ করতে হবে, এ প্রস্তাব সুনীতিবাবুর মনঃপূত হয় নি; তিনি ইংরেজীতেই বললেন। আমারও মনে হয়েছে ঠিকই করলেন। যেখানে আমার স্বভাষা বলার অধিকার স্বীকৃত, সেখানে অধিকাংশে যে ভাষা বোঝে, জেনেও সে ভাষায় না বলে, আমার ভাষা বলা, আমার বিবেচনায়, কতকটা রসিক-সমাজে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ। যত্রতত্র এই ইংরেজীর বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ একটা কৃত্রিম ব্যাপার, দুষ্ট অভিমান, অন্ততঃ নিরর্থক। মস্কো সম্মেলনেই কি ভবিষ্যতের এই আভাস আমি পাঠ করতে পারি নি? ভারতবাসী সকলে ইংরেজী শিখবে—এ অসম্ভব প্রস্তাব আমার নয়। সর্বভারতীয় ভাষার প্রশ্নও এখানে তুলতে চাই না। কিন্তু ভাষা সমস্যা সমাধানের ঠিক পথ যে গৃহীত হয় নি তার প্রমাণ সর্বত্র—আসামও। এবং মস্কোতেও তা আবার মনে হয়েছে—মনে হয়েছে তারপরে কীফ-এ, দিল্লিতে। কিন্তু থাক সে প্রসঙ্গ।

কবিতাগুচ্ছ

নিঃসঙ্গ রাত, রাঙা ভোর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এই তো নিঃসঙ্গ রাত, এই যে আবার রাঙা ভোর,
অন্ধকার দীর্ণ ক'রে বলয়িত উষার উন্মেষ !
ঋতুতে ঋতুতে যত ছায়াময় দুঃস্বপ্নের ঘোর
দীর্ঘ অভিযানে কাটে, জেগে ওঠে বঞ্চিত স্বদেশ !
কেবলি বিক্ষুব্ধ ঢেউ গ্রামাঞ্চলে নগরে-বন্দরে,
লাঞ্ছিত অনেকবার যৌবনের কর্মিষ্ঠ চেতনা ;
বাসায় ভিটায় চিড়, রক্ত স্বেদ অবিরাম ঝরে,
বুভুক্ষু হৃদয় রোখে অন্ধকারে অদৃশ্য ছলনা ।

অন্ধকার ভাঙবেই, হৃদয় আবার খরনদী ;
সিক্ত হবে উপত্যকা, স্নিগ্ধতর ক্ষুধার্তের চোখ—
সিংহদ্বার ভেঙে পড়ে, সিংহাসনে শৃগালেরা যদি,
দৃঢ়বদ্ধ প্রতিজ্ঞায় প্রতিহত হবে যত শোক ।

বার-বার আত্মদানে, লাখো হাতে দৃঢ় সংগঠনে
সুদৃঢ় প্রত্যয়ী হাত কাজ করে সমাজে, মননে ॥

স্বরচিত কবিতায়

শিবশম্ভু পাল

আমার বন্ধুর মুখে গোধূলির আলোর সম্পাত ।
ফুটে উঠল পদ্মবন, বিভাসিত জ্যোতি চতুর্দিকে ।
নেপথ্যে আত্মার রুচি কবিতার পাণ্ডুলিপি দিয়ে
সুচারুসম্মত করে, এই ঘরে, গুণী বন্ধুটিকে ।

আমরা সকলে ওই পদ্মবনে সমাসীন হই,
ঘরের দেয়ালগুলি কখন বিলুপ্ত হয়ে যায় ;
স্বরচিত কাব্য পড়ে অপ্রতিভ কণ্ঠে কবি, যেন
গভীর আনন্দভরে দিশাহারা এমন সন্ধ্যায় !

সফল শব্দের মন্ত্র । তাই এই দৃশ্যমান মায়া
অপ্রতিভ কণ্ঠস্বরে ঘরের সীমানা ভাঙে, আর
কবির চোখের তীব্র উজ্জ্বলতা স্তব্ধ করে দেয়
আমাদের, আমরা যেন রোমাঞ্চিত নিসর্গসত্তার ।

কৃতজ্ঞ বন্ধুর কাছে ; সারা রক্তে বিস্ময়ের বান ।
উৎসবমুখর-এই অনুপম সান্ধ্য আয়োজন :
বাতাসে হিল্লোল তোলে আমাদের মনসিজ ফুল,
ভালো লাগে ক্ষণমৃত্যু, জন্মান্তর, আত্মবিস্মরণ ॥

অন্তরাল

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চলে যাই   চলে যাই অন্য অন্ত দীর্ঘ অন্তরালে,
ডেকেছে অশান্ত পুষ্প, আমি যার আবির্ভাব খুঁজি
অধীর অস্তিত্বে, রক্তে—ফুল, ফুল, উন্মোচন! একবার স্পষ্ট ফুটে ওঠ।

কত না পুণ্যের স্বচ্ছ; প্রীত পাপ, মগ্ন কত প্রবীণ বিষাদ
চিহ্ন হয়ে ঢুকে গেছে সব সম্ভাবনা ভাঙা এ মনে গোপন;
বাতাস ব্যাকুল এসে শরীরের সীমা ঘুরে চুলে অকস্মাৎ
থেমে গেছে তীব্র ক্ষোভে, হু হু কান্না উন্মাদ ব্যর্থতা···
প্রাচীন সমস্ত শব্দ চুরমার দীর্ণ করে বলেছে চীৎকারে
—এ কার   এ কার মুখ! কোন পাপে বিঁধে গেছে ললাটে দেবতা?

যৌবন সমস্ত জানে, জানে বুঝি বাসনা বিশাল
কবেকার রৌদ্র ঘোরে আমার চোখের অধিকারে।

দেবতা আমার বড় তীব্র এক সম্ভাবনা বুকে নিয়ে আছি
যে পদ্মে ফোটাই দুঃখ তাকে নিয়ে সময়ের ভাবী
কোথায় সাজাবে দৃশ্য—জানি নি জানি না, তবু ব্যগ্র
তবু কান পেতে থাকি যদি কোনো শব্দের ঝঙ্কায়
মহৎ সুন্দর বাজে আমার আয়ুর কাছাকাছি

কে আকাশে, কে আভাসে, কে তুমি তখন ব্যর্থ রমনী নগ্নতা!

যাই চলে অন্যমন চলে যাই দ্রুত জন্মান্তরে—
বয়স বিপুল ভার পাথরের মতো এই অস্বচ্ছ শরীরে,
তীর্থ আজো গতি শুধু অন্তহীন পিপাসার রূপ

যখনি অঞ্জলি পাতি যদি এক ঝরনা ফিরে আসে॥

রাজকুমার

মানস রায়চৌধুরী

করুণার ভারে আমি নুয়ে পড়ি, ওরা কি জানে না বনবাসী
আমিও রাজার ছেলে। দুয়োরানী মা আমার বলেছে, 'যাস নে
কোনোদিন প্রাসাদের প্রহরী পেরিয়ে, রুগ্ন ওই পুরাতনে
সিংহাসনে তোর চির উপেক্ষার কথা ওরা শুনুক সকলে।'

'এখনো বোঝে নি ওরা রক্তের মর্যাদা তোর জননীর বুকে
দুগ্ধফেননিভ স্নেহ, একুশ বছরে তোকে করেছে অভীক
সেকি রাজমুকুটের চেয়ে মূল্যহীন, রৌপ্য, হিরণ্ময়, তুষারচুম্বিত
বনিজের বরমাল্য, জীবনের অলব্ধ সম্মান?'

তা যখন নয়, ওরা কেন ডাকে। ভিক্ষুকের এই ছদ্মবেশ
আমার স্বরূপ ভেবে কতলোক অনুকম্পা জানিয়েছে। 'কাকে অবহেলা?'
পাতার ভিতর থেকে চেনা গলা উঠে আসে—রাজার দুলাল
চলে যাবে অন্য এক গ্রহপুঞ্জে, ছায়াপথ অনিবার রথের গোধূলি!

মুহূর্তের রেখা

শ্যামসুন্দর দে

জলের রেখারা আরো কিছুক্ষণ থাকবে।
জলের ভারেতে নত গাছের পাতা
মুখর বৃষ্টির শুধু নীরব অবশেষ।
বাতাসের কানাকানি—আস্ফালন
আরো কিছুক্ষণ ধরে আঁকবে
ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি—বৃষ্টি
ঘনপাতা চারপাশ।

বৃষ্টির রেখারা আরো কিছুক্ষণ থাকবে
ফোঁটায় ফোঁটায় জল,
সবুজ পাতার বুকে সঞ্চয়
ভিজে মাটি বালি আর বৃষ্টি
কয়েক মুহূর্তে শুধু মুহূর্তের দাগ।

তারপর হাওয়ার দিনগুলো—
রোদে পোড়া মাটি আর কান্না
দূরের বালির ঝড়—আবরণ
ভিজে ভিজে মাটি আর ঘ্রাণ।

বৃষ্টির রেখারা আরো কিছুক্ষণ থাকবে।

নিভন্ত রোদ্দুরে

গোপাল ভট্টাচার্য

নিভন্ত রোদ্দুরে বন্দী ভূতে পাওয়া চেতনার মতো
ছায়া নামে জলে ডুবতে। দস্যুর মতন যে সকাল
আমার কৃপণধন লুটে নিয়ে আলোয় মাতাল
দরজা জানলা হাট করে রেখে গেল। তার অনুগত
উদ্দীপ্ত সৈনিক হয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যার বিনত
কুসুম বিঁধেছে পায়ে। যে ইচ্ছারা জলন্ত আকাল
ডানার ঝাপ্‌টায় ঝেড়ে চলেছিল, দিনান্তের লাল
স্মৃতিরেখা ছুঁয়ে ফিরল। অন্ধকার জানালে স্বাগত।

নিভন্ত রোদ্দুরে বন্দী ভূতে পাওয়া চেতনার মতো
ছায়া নামে জলে ডুবতে। আত্মহত্যাকামী এই ছায়া
জানে কি মায়ের স্নেহ আঁচলে ঢাকবে পৃথিবীকে ?
তারপর যখন উষা কন্যার প্রণামে হবে নত
চলে যাবে। জন্ম। মৃত্যু। মৃত্যু থেকে জীবনের কায়া—
বোধির আকাশ হাতে, অন্য হাত সময়ের দিকে।

মিছিলের পথ

সমন্ত ভদ্র

—এখন যাব মা, যাই ?

—এখন কি, মা বলল, আরো পরে যাবি। এখন গিয়ে তো বিরক্ত করা মানুষটাকে।

হ্যাঁ, সন্ধ্যে তো নামে-নামে। এখনো কি দেরি আছে নাকি সন্ধ্যে হবার ? হাড়কলের লোকেরা ফিরল। পদর ছুই জ্যাঠা ফিরল। ঐ শোন, কালিঘাটের গাড়ির শব্দ। ভোঁ ভোঁ সিটি। মানিকের মাসি কয়লা ভাঙছে। পেয়ারাতলা খালি—বিনোদকাকারা তাস-টাস নিয়ে উঠে পড়েছে। বসাকবাড়ির গেটে খাঁচায় পোরা আলো আরেকটু বাদেই জ্বলবে।

খালি পরে, আর পরে। আরো পরে যাস। কত পরে যাব বাবার কাছে, কখন যাব তবে ? বাবার কাছে গেলেই বুঝি বাবাকে বিরক্ত করা হল ? আমি বিরক্ত করি না। কোনদিন করি নি। ক্যানিং এসে পড়বে এর মধ্যে এসে পড়বে। রেলপুলে যাবার আগেই ঠিক চলে যাবে। আমি দেখতে পাব না গাড়ি।

—মা, ওমা—

—কথা শুনবি না, তবে যা। গিয়ে ঘ্যানঘ্যান ক'রো না যেন। যা বলে বসে থাকতে, তাই থাকবি।

—আচ্ছা।

বাদল একলাফে নর্দামা পেরলো। তারপর ছুট। কেউ যেন ওকে ধরে ফেলবে পেছন থেকে এসে। বড় রাস্তায় পড়ে তবে যেন হাঁফ ছাড়ল।

শহরের গা এখনো ভিজে ভিজে। এই কাল সবে ধরন হল বৃষ্টি। কদিন অনবরত কি জল! রাত্তির বেলাও ঝুপ ঝুপ ঝুপ। থামবার নাম নেই। দেয়াল বেয়ে মানুষের গা বেয়ে খ্রীষ্টানদের গীর্জার চুড়ো বেয়ে কেবলি জল ঝরেছে। এখনো তাই সব ভিজে ভিজে স্যাঁতসেতে। কোথাও কলকল

শব্দ হচ্ছে। নর্দামায় জল সরছে। বায়স্কোপের কাগজগুলো টাল খেয়ে খেয়ে বসে যাচ্ছে দেয়ালে। এখানে কাদা, ওখানে কাদা।

কালও খুব মেঘ ছিল। মোষের গায়ের মত রঙ মেঘের। তবে একটু পাতলাটে হয়ে এসেছিল বেলায়। মেঘের গায়ে একটু ফাঁক হয়, আবার জুড়ে যায়, আবার ফাঁক হয়—এমনি। তখন বাবা বলল, দাও না বাপু, এবার একটু রোদ দাও না। কদিন তো খুব ঢাললে—বিক্রির দফা শেষ করে দিলে যে একেবারে। আকাশ বাবার কথা শুনল। আজ রোদ, সারাদিন রোদ। তাও বেরোবার সময় বাবা বলল, বিশ্বাস কি! গিয়ে মাল-টাল যেই বের করে সাজাব, অমনি হয়তো আবার তখনি—

ও ভেবেছিল রেলপুলের ওপর ষষ্ঠী থাকবে। কিন্তু ষষ্ঠী নেই। চলে গেছে ষষ্ঠীটা, নাকি আজকে পুলে আসেনি ও ? ও তো রোজ আসে, রোজ থাকে। রেলিং-এ বুক দিয়ে এত ঝুঁকে দাঁড়ায় যে ভয় ভয় করে।

ক্যানিং-এর গাড়িটা দূর থেকে সবজে লাউডগার মত দেখায়। সবজে রঙ করেছে, যেন লতিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বড় হয়। লাইনের হিজিবিজির মধ্যে নিজের পথটা খুঁজছে। সিগন্যালগুলোর গোড়া ছুঁতে ছুঁতে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। ইঞ্জিনটা এসে পড়ল।

ধ্বক-ধ্বক করতে করতে চলে গেল ইঞ্জিনটা।

চলে যাবার পরও পুলটা কাঁপছিল। এখনো কাঁপছে। পায়ের নিচেটা। আঃ, ঝিম ঝিম করছিল, আর ধোঁয়া। বাতাসটাকে ভূতের মতন কালো করে ছাড়ল।

পুলের ঢালু। যত জোরে চল, তার চেয়ে বেশি জোরে তোমাকে চালিয়ে দেবে। নিচে নামছ কিনা। ওঠবার বেলা কিন্তু উল্টো।

রাস্তায় আলো জ্বলে-ওঠবার আগেই বাদল পৌঁছে গেল।

ভীড় খুব আজ। লোক আর লোক। রাস্তায় গিজগিজ করছে। ট্রামগুলোর গা-ভর্তি লোক। বাসগুলোর পেছনে দলা পাকিয়ে আছে লোক। চৌমাথায় লাল আলো জ্বলে উঠে ট্রাম-বাস-ঠেলাগাড়িগুলোকে যেই আটকে দিল, অমনি এক ঝাঁক মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ ছুটোছুটি করে রাস্তা পার হতে লাগল। আর ওরাও। মাথায় যাদের তরকারির ঝাঁকা, ওরাও পার হচ্ছে। সাদা বেগুন আর বড়ো বড়ো কুমড়ো নাচতে নাচতে চলেছে। জাল জড়িয়ে আটকানো তাই, একবার যদি ছেঁড়ে!

চায়ের দোকানে তিনখানা বেঞ্চিই ভর্তি, খুব রগড়ের কথা হচ্ছে। না হলে সবাই অত হাসবে কেন। বোয়েম থেকে বিস্কুট বার করছে, ঐ লোকটা বাদলকে চেনে। ধূপকাঠিওয়ালা ঠিক ওর জায়গায় দাঁড়িয়ে। বাণ্ডিলটাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে ; ছেলেকে আদর করছে যেন। ফলের দোকানের পাশেই কাঠের তাক বোঝাই কাচ আর চীনামাটির বাসন। মনোহর বলে লোকটা ঐসব কাচের আর চীনামাটির বাসন বিক্রি করে। টুলে বসে আছে ; কে আর একজনের সঙ্গে কথা বলছে মনোহর। নিচু দরজা-ওয়ালা দোকানটা কেষ্টকাকুর। তার বাঁ-দিকে চৌকো ঘড়িওয়ালা ওষুধের দোকান। মাঝখানের দেয়ালটার সামনে এসে বাদল দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কই, বাবা কোথায় গেল? বাবা? এইখানে তো থাকবে। এপাশে তাকাল, ওপাশে, ওপরে হোটেলের ঝুলবারান্দার দিকে। চোখ ফিরে এল। এই দেয়াল—হ্যাঁ, এটাই তো, বিলুর সবজে মশারির মত রঙ, বৃষ্টির জলের দাগ-ধরা এই দেয়াল। এই দেয়াল, ডানদিক কেষ্টকাকুর মাদুরের দোকান, বাঁদিকে ওষুধের। ফাঁকা বলে অন্যরকম লাগছে। কিন্তু বাবা নেই, বাবার জিনিসপত্রও নেই। বাবার বিক্রির জায়গা এটা। এখানটায় বাবা দাঁড়ায় পালকের ঝাড়ু হাতে নিয়ে ফ্রক ইজের গেঞ্জি রুমাল আর রঙবেরঙের বাচ্চাদের টুপিগুলো ঝেড়ে ঝেড়ে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে।

ওই তো। ওই তো বাবার জিনিসপত্তর তেরপল-বাঁধা। কেষ্টকাকুর দোকানের ভেতর। দেখতে পেল বাদল। তবে বুঝি—

—কেষ্ট কাকু—

দুজন খদ্দের বেরিয়ে গেল কেষ্টকাকুর দোকান থেকে। কেষ্টকাকু মাদুর ভাঁজ করতে করতে তাকাল।

—কেন এইচিস তুই?

—বাবা কোথায় কেষ্টকাকু? বড়বাজার গেছে?

—যা বাড়ি যা। কোথায় গেছে না গেছে তা দিয়ে কি করবি?

একজন পাখিওয়ালা ওর পাশ দিয়ে গেল। হাতে খাঁচার সুন্দর পাখিটা শিস দিচ্ছে। ওমা, পাখিটা তো নয়, পাখিওয়ালা নিজেই। বাদল অন্যমনস্ক হল।

কেন এইছিলি?—ঘাসের আসনগুলোর ধুলো ঝাড়ছে কেষ্টকাকু। সেদিনও বাবা বড়বাজার গিয়েছিল, কেষ্টকাকু ওকে দোকানে বসিয়ে রেখেছিল।

বাবার পালকের ঝাড়ুটা হাতে বুকে মুখে বুলোতে বেশ লাগে! সেদিন অনেক-কক্ষণ কেষ্টকাকুর দোকানে মোড়ার ওপর বসেছিলুম।

—বাবা আমায় আসতে বলেছিল।

—আসতে বলেছিল? কি, কেন? চাল কিনে রাখবে বলেছিল?

বাদল ঘাড় কাত করল।

অ!—ধুলো ঝেড়ে কেষ্টকাকু আসনগুলো গুনতে লাগল। গুনতে ভুল হল। আবার গুনল। তারপর একটু যেন বেজার হল কেষ্টকাকুর মুখটা।

তারপর বলল, তা তুই থেকে কি করবি? বাড়ি যা—একটু থামল কেষ্টকাকু। কি ভাবল। আবার বলল, হ্যাঁ তাই যা। বাড়ি যা তুই। কখন ফিরবে কে জানে? হুজুগে মানুষ!

এখন যদি দাঁড়িয়ে থাকি, কেষ্টকাকু বকবে। কেষ্টকাকুর হাতের শিরাগুলো কি মোটামোটা। ষষ্ঠীর বড়মামার হাতের শিরাগুলোও অমনি। ষষ্ঠীর বড়মামা অসুখে পড়ে যখন তিনমাস হাসপাতালে ছিল, তখন ওর হাতের শিরা ফুটো করে ডাক্তার নাকি তিনবার রক্ত নিয়েছিল। হ্যাঁ, তিনবার। ষষ্ঠী বলেছে।

ওষুধের দোকানে চৌকো ঘড়ির মাঝখানে চোখের মত দুটো গর্ত। কাঁটা দুটো একটা আর একটাকে ঠেলছে। বাবা যদি এক্ষুনি এসে পড়ে! হ্যাঁ, আসছে! রাগ হল বাদলের। আমার কথা কেষ্টকাকুকে কেন বলে যায় নি বাবা? ভুলে গেছে? কেন ভুলল?

পানের দোকান। তার পরেরটা খাবারের। চায়ের দোকানে গোল উনানে জল ফুটে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মনোহর ওকে ডাকল। যে লোকটার সঙ্গে মনোহর কথা বলছিল, তাকে ও কোনদিন ছাখে নি।

—তারাপদদার বড়টি, এই যে। কি রে, বাবাকে খুঁজতে এইছিলি?

—হুঁ। বাদল ঘাড় নাড়ল।

লোকটা খাকি শার্টের পকেট থেকে বিড়ি বার করে ফুঁ দিল। ওর দিকে এক নজর তাকাল। গরম হচ্ছে বলে বোধ হয় ও বুকের বোতাম আটকায় নি একটাও।

—ছ-সাত বছর বয়েস হবে?

—ঐ রকম।

কাচের কুঁজোটায় বাদলের ছায়া পড়েছে। কেমন থ্যাবড়ানো ছায়াটা।

পেছন দিয়ে পর পর কজন লোক চলে গেল। বাবা কত দেরি করবে। এতক্ষণ চালের ঠোঙা ঝাড়নে বেঁধে বাবা বলত, এই জায়গাটা ধর্। পারবি তো? ফেলিস না যেন। ও কোনদিন ফেলে নি। মনোহর কি বলছিল। খাকি শার্ট বললে, তারাপদও মিছিলে গেল বুঝি?

মনোহর ঘাড় নাড়ল।—উৎসাহ বেশি তারাপদদার। ওদিকে পাচু আর লক্ষ্মণ গিয়েছে, আটা-কলের ফটিক, আর—

—ওরা তো ছেলেমানুষ। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল লোকটা। ধোঁয়া বাদলের নাকে লাগল।

—তুমি গেছিলে কোথায়?

—মানিকতলা গেছলাম। পিসির অসুখ।

—এঃ, দেখলে না মিছিলটা!—মনোহরের মুখটা টান-টান হয়ে উঠল: পেছনটা তখন বাটার দোকানটার কাছে, না মোড় পেরোয় নি তখনো, আর সামনেটা ধর—

—আসল মিছিল শুনছি ময়দান থেকে বেরোবে?

—হ্যাঁ এগুলো ছুটকো-ছাটকা। তাই এই—

বাদল রাস্তার কোলে এসে দাঁড়াল। ওরা দুজন গল্প করছে। রাস্তা পার হব? একটা লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পিচবোর্ডের পুতুল বিক্রি করছে। হ্যাঁ, সেই লোকটা। খুব মজার কিন্তু লোকটা। পা তুলে তুলে নাচছে। লোক জড়ো হয়েছে। ওর নাকে অতবড় চশমাজোড়াও পিচবোর্ডের, আর গোঁফটা বুঝি তুলোর?

বাবা মিছিলে গিয়েছে। বাবা! ওর হাসি পেল। হেসে উঠতে গেল। মিছিলে! বাবা! ওর খুব অবাক লাগল। ও ভেবেছিল বাবা বুঝি বড়বাজারে।

এই রাস্তায় মিছিল গিয়েছে।

এখন রাস্তা পার হয়ে কি হবে? বাড়ি? বাড়ি গিয়ে কি করব? মা এখন খেতে দেবে? খিধের কথা বললে মা বকবে। এই পথ ধরে মিছিল গিয়েছে। বাবা গিয়েছে। আমরা সেদিন মিছিল করেছিলাম। কানু লাল পাতলা কাগজ এনেছিল নিশান করবে বলে। ষষ্ঠী, অত-রতু, মদনা—সব এসেছিল। লাইন করে দাঁড়াল। ষষ্ঠী বলল ইনকেলাব বলি, কানু বলল, না, আর একটা আছে। আমি বলব আমাদের দাবি, তোরা বলবি—

আমি যদি যাই?

বাদল হঠাৎ যেন ঝাঁকি খেয়ে শক্ত হয়ে গেল। আমি যাব। হ্যাঁ মিছিলে—মিছিলে যাব। বাবাকে খুঁজব। খুঁজে বার করব। মিছিলে—

বায়স্কোপ বাড়িটার বারান্দায় ফুলের থোকা দুলছে। লোকজন, ঠেলাগাড়ি ভর্তি রাস্তায় বেগনী আলোর ছটা। ফুলের থোকাগুলোর ছায়া পড়েছে ফুটপাথে। নতুন রাস্তার মোড়ের খুব উঁচু বাড়িটার জানলাগুলোয় দপদপ করে আলো জলে উঠল। ও-বাড়িতে কত লোকের শোবার জায়গা।

আচ্ছা মা এখন কি করছে? ও বাড়ি ফিরলে তবে তো মা বিলুকে ভিজে কাঁথা থেকে তুলবে, আর বাদলকে বলবে মাদুরটা ঘুরিয়ে পেতে দিতে। বিলুটা ভিজে কাঁথার ওপর কি করে যে অত ঘুমোয়! রাস্তার দিকের জানলাটা মা নিজেই বন্ধ করেছে নিশ্চয়, নইলে তো ধোঁয়ায় একাকার। কাপড়ে চুলে বাক্স-টাক্সয় কুচি কুচি কয়লার গুঁড়ো। গলায় ঘামে কয়লার গুঁড়ো এসে আটকায়—কি বিশ্রী। মা বকছে নিশ্চয় জানলা বন্ধ করবার সময়।

রাস্তার আলো জলছে। সন্ধ্যে হয়েছে। বায়স্কোপ বাড়ির কাছে দিনের মত আলো হয়ে থাকে সব সময়।

এদিকের পানের দোকানটা বায়স্কোপ বাড়ির পাশেরটার মত বড় না। আর অত রকম বোতল নেই এটায়। পানওয়ালা বিড়ি বাঁধছে। পাশের গলি থেকে একজন মোটা-মত লোক রাস্তার টেপা-কলের দিকে যাচ্ছিল। দাঁড়াল। কাপড়টা লুঙ্গির মত করে পরা, দুহাতে বালতি ঝুলছে দুটো। মোটা লোকেরা হাঁটবার সময় দোলে। ও লোকটাও দুলছিল।

পানওয়ালা কপালে হাত ছোঁয়াল মোটা লোকটাকে দেখে। বালতি দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, মেজবাবু আপনি নিজে কেন?

—কি করি বল, ঘরে এক ফোঁটাও জল নেই।

—কেন, ফটিক কোথায়?

—ফটিক নেই। গোরা দাশু কেউ নেই। ময়দানে গিয়েছে নাকি সব। দাও মালি, পান দাও একটা।

পানওয়ালার কাঁধ দুটো নড়ল। একটু হাসল পানওয়ালা।

আজ সব ওদিকে। তাই দেখলাম বনোয়ারী দাশের ভুসিমালের দোকান তালাবন্ধ। লোকজন ঝেঁটিয়ে সব পালিয়েছে—

বালতি রেখে মোটা লোকটা পান নিল। বোঁটাশুদ্ধ চুন নিল। রাস্তায় ঢং ঢং করে ট্রামের শব্দ হচ্ছে। কোথা থেকে এক ঝাঁক ট্রাম এসে গেছে এক সঙ্গে। পিছনে অনেক গাড়ি। রাস্তা জাম হয়ে গেছে।

হরিবোল উঠল ওদিকে। মোটা লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

ব-ল হরি—

খুব সাজিয়েছে খাটটা। অত ফুল। বসাক বাড়ির বড়-মা মারা গেলেও খুব সাজিয়েছিল। খাটের বাজুগুলো যেন সাদা সাদা পদ্মফুল দিয়েই তৈরি মনে হয়। ফুটপাথের ওপরে খই এসে পড়ল। দুজন ধামা হাতে করে যাচ্ছে, আর দুজন ছড়াচ্ছে খই।

হরিবোল!

হরিবোল—

—সাঁতরা মারা গেল।—মোটা লোকটা বলল।

—কোন সাঁতরা মেজবাবু?

—দীননাথ সাঁতরা।

—ও হ্যাঁ, মস্ত লোক। শুনেছি কলকাতার ওপর নাকি ছ-খানা বাড়ি—তেলকল—মারা গেল কিসে?

—আত্মহত্যা করেছে চারতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে।

—বলেন কি, অতবড় লোক—

মোটা লোকটা ফিক করে পানের পিক ফেলল। কোমরের কাপড়টা ঠিক করে বালতি তুলে নিল। বলল, উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে। ঘুর হবে খুব। করবে কি, প্রোসেশন যদি পথ আটকে দেয়?

খানিক দূর গিয়ে বাদল দাঁড়াল। রাস্তা ঢালাই-করা ইঞ্জিনটা দেখতে একটা বিদঘুটে জন্তুর মত। হ্যাঁ, বিদঘুটে। ফুটপাথের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিনটা। কলটার নিচে একটা ছায়া নড়েচড়ে উঠল; তারপর। ও কে রে? হি হি করে হাসতে হাসতে ওর মত একটা ছেলে বেরিয়ে এল।

আব্বু—আব্বু—আব্বু। এই আব্বু দিয়েছি কিন্তু—আরেঃ!

ওর মুখোমুখি এসেই থমকে গেল ছেলেটা। নারকেলের খোসার মত চুলগুলোয় ঝাঁকি দিল।

—ইস, আমি ভেবেছিলাম গৌর।

বাদল মাথা নাড়ল। বলল, তোমরা কি খেলছিলে?

—চোর-পুলিশ।

—আমি হলে ধরে ফেলতুম।…আচ্ছা এ রাস্তায় মিছিল গিয়েছে, না? তুমি দেখেছ?

—হুঁ উ উ। গাড়ি-টাড়ি সব থেমে গেছল। টুনুর ছোটকা আমাকে আর টুনুকে সাইকেল নিয়ে যেতে বলল। আর বলল বাড়িতে বলিস না যেন আমি গিয়েছি।

—বললে বকবে?

—হুঁ, টুনুর ছোটকাকে। ওর জ্যাঠামশায় খুব রাগ করে। খুব চেঁচালে ছোটকার গলা দিয়ে যে রক্ত বেরোয়, তাই।

বাদল ডানদিকের চওড়া ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল। মিছিলটা কতদূর কে জানে, এতক্ষণ ময়দানে পৌঁছে গেছে? রাত হয়ে গেল। বাড়ি ফিরলে মা বকবে। ভীষণ রেগে থাকবে মা। সেদিন এমন মেরেছিল, চুল ধরে এমন টেনেছিল যে মার মুঠোর সঙ্গে গুচ্ছের চুল উঠে গিয়েছিল। বাদল মাথার চুলে হাত বুলোল। গোড়াগুলোয় কি এখনো ব্যথা? বাবার জ্বর সেদিন। বিছানায় শুয়ে ছিল বাবা। মা আমায় পয়সা দিয়েছিল লেবু কিনে আনতে। আমি তো তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম। ষষ্ঠী আমায় একটুক্ষণের জন্যে লাটাই ধরতে বলল। আমি কি জানি ও অতক্ষণ পরে ফিরবে? জানলে ধরতাম না। মা মেরেছিল। মার ভুরুর পাশে শিরা বেগনী হয়ে উঠেছিল রাগে।

আরেকটা চৌমাথায় এসে গেল ও। ট্রাম লাইন বেঁকে গেছে ডাইনে, আবার সোজাও। ফুটপাথের ওপর একটা গাছ—বড় বড় পাতা, কিন্তু ঢেঙা হয় নি তেমন। ঐ উঁচু বাড়িটার ছাতে উঠলে মিছিলটা দেখতে পেতাম। উঁচু জায়গা থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। বসাকবাবুদের চিলকোঠা থেকে সিধে লাইনে চারটে সিগনাল দেখা যায়। ষষ্ঠীর সঙ্গে উঠেছিলাম একদিন। ওদের বাড়ির অংশুর সঙ্গে ষষ্ঠীর ভাব ছিল। ষষ্ঠী একদিন খুব চুপি চুপি বলল যে ইস্কুলে চেয়ারের দৌড়ে অংশুকে ও চালাকি করে জিতিয়ে দিয়েছে। ও, তাই। কেন অংশু ওকে অত ভাব দেখায়, তাই!

অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে বাদল একবার দাঁড়াল। হাঁপ ধরে গেছে।

জোর পায়ে হেঁটেছে, তাই। এপাশে একটা বাড়ির রক, কিন্তু বসবে না ও। কলকাতার রাস্তাগুলো একরকম দেখতে অনেকটা—বাড়ি, লাইনের মাথার ওপর পাকানো দড়ির মত ট্রামের তার, কলের কাছে ঝাঁঝরি। একটার সঙ্গে আরেকটা একরকম। অবিকল। এ-রাস্তাটা ছোট একটু, পালিশ করা ক্ষুরের মত চকচক করছে। রাস্তা-সমান-করা ইঞ্জিনটা অত খাটে। বলে তো চকচকে হয় রাস্তা। ওটা একশোবার করে যায়, আবার পেছনে আসে। সারাদিন খাটছে। খাটছে আর হাঁপাচ্ছে। মস্ত বড় বড় তিনটে জাঁতা। জাঁতা তিনটে খোয়াগুলোকে রাস্তার শক্ত চামড়ার নিচে পিটিয়ে ঢুকিয়ে দ্যায়। হাড়কলের সামনে রাস্তা সমান করবার জন্যে অমনি একটা কল এসেছিল। আরো বড় সেটা, এটার চাইতেও। তবে দেখতে এমনি, এমনি একটা বিদঘুটে জন্তুর মত। মানিকদের বেরালের বাচ্চাটাকে চাপা দিয়েছিল সেই ইঞ্জিনটা। হোঁতকা চাকাটা ধ্বক-ধ্বক করতে করতে গড়িয়ে চলে গিয়েছিল বাচ্চাটার ওপর দিয়ে। বাচ্চাটাকে থেঁতলে। পোটার দলার মত দেখাচ্ছিল রাস্তায় মরা বাচ্চাটাকে।

এখানে রাস্তায় একটা ভীড়। লোক জমেছে। আর একটা রাস্তা বাঁ-দিকে মিশেছে। সেইখানে ভীড়টা। লোকগুলো দলা পাকিয়ে ছিল, এখন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে কে একজনের কথা শুনে কি লোকগুলো ওরকম অস্থির হয়ে পড়েছে? অত চেঁচিয়ে কথা বলছিল ঐ লম্বা থুতনি-ওলা লোকটা না? আর বুক পকেটে চশমার খাপ উঁচু হয়ে আছে। আহ্, এখন কি গরম! বাতাস গরম। আর আকাশটা সাফসুফ। ঐ লোকটার কথা এখনও শেষ হয় নি। কে যেন 'মন্টু, এই মন্টু'—বলে কাকে ডাকছে। পাশের লোকেরা কথা বলছে। একসঙ্গে অনেকে বলছে। থামছে। একটা গলা সবাইকে ছাপিয়ে উঠছে। খুব জোরে। আবার থামছে। চৌকো-মুখ লোকটার ওপাশে খুব তর্ক। জোর গলা। এখনো চলছে। আর বাঁ-দিকের প্যাণ্ট পরা দুজনার মধ্যে যে বারবার চুলের মধ্যে হাত চালাচ্ছে, ওকে দেখতে ষষ্ঠীর ছোট-মামার মত। ওরাও কি কলেজে পড়ে?

আর একজন পিছনে এসে ওদের কাঁধে হাত রাখল। পিছন ফিরে ওরা অবাক হল।

—আরে! একি!

—বেশ ছেলে তুই জিতু, উঠে এলি?

—এই শরীরে—

—জ্বর নেই এখন, মাইরি বলছি, ছাখ—ও হাত বাড়িয়ে ধরল! তারপর একটু ঠোঁট চাটল। বলল, একা একা কতক্ষণ থাকব? মেস একদম ফাঁকা! বারবার ঠোঁট চাটছে। একটু জল পেলে এখন ও খেত।

—শুনলি, কি বলল?

ওপাশে চৌকো-মুখ লোকটা নাকের তলা মুছে নিল। বাতাসে নস্যির গুঁড়ো উড়ে গেল।

—ঝেড়ে বলেছে। ব্যবসাদারদের গুদামওলাদের ধর। চাল আছে। দাম কেন কমে না?

কে যেন বললে, উনি তো মাস্টার, না?

—হুঁ, কেশব বিদ্যাপীঠের—

—বেশ বোঝাতে পারেন কিন্তু—

চৌকো-মুখকে ঠেলে ভীড়ের ভেতর থেকে পাজামা পরা ছিপছিপে একজন রাগতে রাগতে বেরিয়ে এল। এই লোকটা কি তর্ক করছিল! এই লোকটার অত জোর গলা? চৌকো-মুখ চোখ ছোট করল।

—হ্যাঁ মশাই, আমরা নাবালক, আমাদের কিছু বুঝে-সুঝেও কাজ নেই। চোখে আটা লাগিয়ে কানে ছিপি গুঁজে বসে থাকি।

বাদল খিক খিক করে হাসল। কেন ওর হাসি পেল!

ঢেঙা লোকটা ধমক দিল ওকে।

—এই! এ ছোঁড়া মজা পেয়ে গেছে!

বাদল চট করে পিছনে সরে গেল। লোকটার কনুই যেন একটা হাতুড়ি। পাশ কাটিয়ে ফুটপাথে উঠল ও। একটা মুদীদোকান বন্ধ হল। দোকানের ফতুয়া-পরা লোকটা তিন-চার বার করে কবাটের তালা টেনে টেনে দেখল, তারপর চাবি রাখল পকেটে। সঙ্গের লোকটাকে কি যেন বলছে, দুজনে বোধ হয় আলাদা দিকে যাবে। পাশের লোহালক্কড়ের দোকানটাও বন্ধ করছে এবার। এদিকে সবই বন্ধ, রাস্তাটা এক একবার খুব ফাঁকা লাগছে। আবার হয়তো লোক আসছে। গাড়ি আসছে একটা দুটো। লোকে দিককার খবর জিজ্ঞেস করছে। রাস্তায় ছোট ছোট জটলা। আবার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

একটা উঁচু বাড়ির বরফি-কাটা লোহার গেটের সামনে উর্দি পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে। সঙ্গের লোকটা ওর বন্ধু বুঝি, দুজনে কি দেখে খুব হাসছে। সিঁড়ির ওপাশে গিয়ে বাদল দেখতে পেল, আগে পায় নি। একটা লোক খুব ব্যস্ত হয়ে, একটা ভাঙা উনানে ফুঁ দিচ্ছে। ফুঁ দিতে দিতে হাঁফিয়ে উঠেছে। খাকির আঁট-সাঁট প্যান্টুল পরনে। প্যান্টুলটার সব জায়গা ছেঁড়া। আর খাকি সার্টের পকেটের ওপর তোবড়ানো মেডেল ঝুলছে একটা, ওটা তো টিনের। গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিয়ে চলেছে লোকটা, আর তাই দেখে দারোয়ান আর ওর বন্ধুটার কি হাসি!

—ও কি হচ্ছে, এ মিলিটারি—

বাদল ভীষণ অবাক! উনানে আগুন নেই, কয়লা নেই, কিছু নেই। তা গ্রাহ্য নেই লোকটার। একরাশ ঝুপসি মত চুল লোকটার। কান বেয়ে নেমেছে। গোল গোল সুপুরির মত দুটো চোখ। গা শিরশির করে।

—শুনছ না, কি বলছে?

দারোয়ান হাসছে। হে হে হে হে হে—

—ও মিলিটারি—

—জান না, ওর ভায়রা গিয়েছে প্রশেসনে?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, চাল আনতে গিয়েছে। বলে—উনুনটা জ্বেলে রাখি, চাল নিয়ে ফিরলেই চড়িয়ে দোব।

পাগল। ও লোকটা পাগল।

রেল-পুলের নিচে একটা পাগল শুতো। গাড়ির শব্দ শুনলেই উঠে দাঁড়াত। কাপড় জড়ানো লম্বা কঞ্চি ছিল একটা ওর, ঘন ঘন নাড়ত সেটা, আর বাঁশি বাজাত। ষষ্ঠী বলেছিল, লোকটা সত্যিকার পাগল না, বদমাশ ছেলেধরা। কি করে জানলি? ওকে ওর বড়মামা বলেছে। পুলের ওদিকে বেশি যেতেও বারণ করেছে। পুলের ওপর থেকে আসতে আমার একদম ইচ্ছে করে না কিন্তু। —ষষ্ঠী বলেছিল আমারও করে না। বাদল মাথা নেড়েছিল। সত্যি সন্ধ্যে হয়ে গেলেও ইচ্ছে করে না ওর নামতে। রেল লাইনগুলো কতকগুলো এলোমেলো রশির মত পড়ে আছে নিচে। একটা একটা করে গাড়ি যায়, ষষ্ঠী সব চেনে। কোনটা কোথাকার। কোনটা কোথায় যাবে। কোন লাইনে। গাড়ির রঙ, ইঞ্জিন নতুন কি পুরনো সে...

...দিতে পারে। ডায়মন-হারবার আসছে, অত ঝুঁকিস নে। ··দুহাত ... সিগনাল দেখে বলে দেয়, দাঁড়াবে এটা—বজবজ ছাড় পায় নি এখনো। ... কি কালি! ধোঁয়া আর কালি—গরম ঝাপটা মারতে মারতে পুলের তলা ... ছুটে গেল। ভোঁসভোঁস করে হাঁফাতে হাঁফাতে গেল! কালো ধোঁয়া ...করে দিয়ে গেল সারা গা।

...যদি কোনদিন পড়ে যাই? পুলের ওপর থেকে নিচে পড়ে যাই? ...লের গা কেঁপে উঠল। লোহার রড ভেঙে পড়া অত সোজা না। কিন্তু ... যদি একদিন! উঃ, বাদল চোখ বুঁজল। ঘুরতে ঘুরতে পড়ছি—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ধোঁয়ার চুলের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে। ওলট-পালট খেতে খেতে। ... তখনি একটা ইঞ্জিন হয়তো নিচে, ইঞ্জিনের চোঙা। চোঙার ভেতর ...গেলাম, চোঙাটা যেন আমায় গিলে ফেলল—আর ভেতরে গন্‌গন্ ...ছে আগুন, গলা আগুনের একটা চৌবাচ্চা··

ডান দিকে একটা মাঠ পড়ল এবার। উঁচু উঁচু গাছ। অনেকগুলো ...কানো লোহার রেলিঙের বেড়া। খুব ঠাণ্ডা লোহার রডগুলো। বাদল ...ছুঁতে চলল। ভেতরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। লম্বা লম্বা পাতার ...য়া মাটিতে। বাতাস থমকানো ভাব। রবার জোড়া লাগাবার মিষ্টি গন্ধ আসছে কোথা থেকে

পেটে খিধেটা চিনচিন করছে। একবার মোচড় খেল, পেটের খালি ...টা যেন উল্টে গেল। পায়ের নিচে থসথস করছে। চামড়া উঠছে। ... যাবে। বাদলের রাগ হল। বাবার ওপর রাগ। বলে যেতে কি ...ছিল, কেন ফাঁকি দিয়ে গেল বাবা?

কাঁধে বস্তা নিয়ে একটা বুড়ো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে। কোথায় ...ে ও? মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে আর নাক ঝাড়ছে বুড়ো। দড়ির ...দি। মাথায় বাঁধা গামছার একটা দিক ঝুলছে, তাতে নাক মুছল। ...ই আগে পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আসছে ও। ওর বস্তার ... গুচ্ছের শিশি-বোতল। শব্দ থেকে বাদল বুঝল।

বাদল নজর করে দেখল বুড়োর বাঁ পা-টা। পা ফেলার সময় গোছটা ...যেন লাফিয়ে উঠছে।

—খুব ব্যথা? হঠাৎ জিজ্ঞেস করল বাদল।

—হুঁ।—বুড়ো ওর দিকে তাকাল। তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

—কি ঢুকেছিল পায়ে? রাস্তায় পড়ে গেছলে?

—উঁহু, ওসব না।—বুড়ো মাথা নাড়ল গম্ভীরভাবে। ওর চোয়াল হাড়... দরজার ছিটকিনির মত।—এ অন্ত ব্যারাম।

বাদল ওর পায়ের গোছটা আবার দেখল।

—তুমি হাসপাতালে যাও নি কেন?

তার কোন জবাব দিল না বুড়ো। বাদল ভাবল হাসপাতালে গেলে অস্ত্র... করতে বলবে সেইজন্যে যায় নি। কিন্তু সারিয়ে দেয় তো ওরা। ... বড়মামার শিরা ফুটো করে তিনবার রক্ত নিয়েছিল। সারা গা শিরায় শিরায় ভর্তি সবাইর। শিরার সব রক্ত বুকের একটা জায়গায় গিয়ে জড়ো হচ্ছে। পরিষ্কার হচ্ছে। সেই জায়গাটা—

রাস্তার মোড়ে এসে, চৌকো জলের ট্যাঙ্কের কাছে বুড়ো বস্তা নামাল। তেষ্টা পেয়েছে। ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে কল টিপল বুড়ো। সরু হয়ে জল বেরোচ্ছে।

হনহন করে দুজন লোক উল্টোদিক থেকে আসছে। ট্রাম স্টপের কাছে এসে ওরা থমকাল একটুক্ষণ। রোগা মত লোকটার হাতে ওটা কি বাজনার যন্তর? একজন নিচু হয়ে সিগারেট ধরাল, তারপর আবার জোর পায়ে চলে গেল। রেস দিচ্ছে যেন দুজনে।

বুড়োর দাড়িগুলো ভিজে থুতনির সঙ্গে লেপ্টে গেছে। বেড়ালের গায়ের মত রোঁয়া রোঁয়া দাড়ি। মুখ তুলে ও বাদলের দিকে তাকাল।

—জল খাবি, এই বাচ্চা?

—উহুঁঃ।

—হাঁপ ধরেছে তোর, না?

বাদল মাথা নাড়ল।—মোটেও না।

কি ভেবে বুড়ো একটু হাসল। তারপর বস্তা তুলে নিয়ে আবার চলতে লাগল। সব লোক হাঁটছে। আজ আর ট্রাম চলবে না। ট্রাম ... বাসগুলো সব কোথাও আটকা পড়েছে। গেলবার কালীঘাট গেছলাম ট্রামে চেপে। মা নতুন গামছা পৈতে আর চিত্তির করা সরা সঙ্গে নিয়েছিল। ট্রাম যখন একবার হেঁচকা দিয়ে থেমেছিল, আমি সামনের মোটা মেয়েলোকটার ওপর পড়ে গেলাম। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম কো... ওপর। খুব হাসি পেয়েছিল। একটুও কিন্তু লাগে নি। ট্রামে ...

...ভাড়া নেয়, উঠলেই, অল্প দূরের টিকিটে পয়সা কম, আর যেই বেশি দূর যাও—

—তুমি রোজ হাঁট, অনেকদূর হাঁট, না?—বাদল জিজ্ঞেস করল বুড়োকে: রোজ?

—করব কি, শালার কপাল!

বুড়ো সর্দি ঝেড়ে নাক মুছে নিল। হাঁটু চুলকোল। তারপর বলল, ছেলে টাকা পাঠাত আগে, দুতিন বছর কষ্ট পাই নি। হ্যাঁ তখন চলত—হাতে টাকা, হাঁটাহাঁটি ছিল নি, বস্তা বওয়া, দোরে দোরে ঘোরা—কিছু না।

বুড়োর গলা সর্দিতে বুজে গেছে। ছিটকিনির মত চোয়ালের হাড় নড়ছে। আরো ঝুঁকে হাঁটছে ও, গামছার ধারটা উড়ে মুখের ওপর পড়ছে। ...পোস্টাপিসের ফরমে পুরো নাম লেখা থাকে। পিওনটা ছিল খুব ভাল লোক। সে বলত, পুণ্যি করেছিলে, নইলে আজকালকার ছেলেরা বাপকে ... পৌছে—

একটা সোরগোল আসছে। কোথা থেকে যেন। বাদল কান পাতল। ...রে কি ফাটছে। কি? ক্রম ক্রম করে শব্দ হল গোটাকত। লোকেরা ব্যস্ত। আরো ব্যস্ত। কটা ছুটকো গাড়ি এদিক-ওদিক থেকে এসে পড়ছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টোদিকে। ঘোঁ ঘোঁ শব্দ করছে। ভেঁপু বাজাচ্ছে। বুড়ো ছেলের কথা বলছে···খাদে ধ্বস নেমে মারা গিয়েছিল বলে ছবি বেরিয়েছিল খবরের কাগজে।—ছোট জামাই কার কাছে খোঁজ পেয়েছিল কি জানি? আগে তো আমাকে বলে নি—

বাদল অন্যমনস্ক। গম্বুজওলা বাড়িটার ছাতে মস্ত বিজ্ঞাপনের ছবিটা দেখছিল ও। ময়ূর আর নাচউলী। শুধু ওরা দুটিতে না, লাল রঙ, হলুদ রঙ আর গাঢ় নীলের ঢেউগুলোও যেন নাচছে ওদের সঙ্গে। নিচে ঢাকনা পরানো চারটে আলো। আলোর ফেনা।

হঠাৎ চমকে ওঠে বাদল। রাস্তাটা গমগম করে উঠল। একটা লোক চীৎকার করে কি বলতে বলতে আসছে। গাড়ির শব্দ লোকজনের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছে। রাস্তার লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওকি চলে যেতে বলছে? সবাইকে? কেন?

—রাস্তায় থাকবেন না কেউ আপনারা—রাস্তায় থাকবেন না—

—চলে যান। চলে যান সবাই—

লোকটার রুক্ষ এলোমেলো চুল। জুলপি বেয়ে ঘাম নামছে। গলায় ঘাম। ঘাড়ে। পরনের পাজামা নিচের দিকে ছেঁড়া। মুখের দুধারে হাতের চেটো দিয়ে চীৎকার করতে করতে চলে গেল লোকটা। একটা ফীটন গাড়ির ঘোড়া বিগড়ে গেছে, কোচম্যান মরিয়া হয়ে চাবুক মারছে। জন তিনচার লোক হাঁফাতে হাঁফাতে পাশ দিয়ে গেল। একজন টেলিগ্রাফের খুঁটি ধরে নিজেকে সামলে নিল। ওকি আবার, কোমরে হাত দিয়ে লোকটা যে বমি করছে। হ্যাঁ, বমি। সব কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। অন্যরকম।

ঘেস-বোঝাই মস্ত একটা লরি এখানে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? ও, কল খারাপ। তাই গলির মুখ আটকা। এ গলিটা ঠিক সোজা এসে রাস্তায় মেশে নি। একটু তেরছা। আর একটুখানি ফাঁক থাকলেও পিছনের রিক্সটা রাস্তায় এসে পড়তে পারত। ঘেসের পাহাড়। পথ আটকা।

ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং—

রিক্সার তো ভেঁপু নেই, ওর গলাটা কেমন মেয়েলী। ঐ বুড়ো, আর সঙ্গের বাচ্চা-কোলে মেয়েলোকটা এবার কি করবে? ওরা গলির ভেতর থেকে রিক্সায় আসছিল। লরিটা এক্ষুনি আর চলছে না। হাফপ্যান্ট-পরা বেঁটে ড্রাইভার ঝুঁকে ইঞ্জিন শোধরাবার চেষ্টা করছে খুব যদিও।

—আঃ কি বিপদ!—চশমা-পরা বুড়োর মুখটা রাগ-রাগ দেখাল। এবার নাম। আর কি। রিক্সা থেকে নেমে পড় নীলা। এই লরিগুলো হয়েছে—

ড্রাইভার একবার ঘাড় উঁচু করে ওদের দিকে তাকাল। ওর পেটটা একটা উপুড় করা চাটুর মত।

বুড়ো নিজে আগে নামল। বাচ্চা-কোলে মেয়েলোকটা সাবধানে নামল পরে। মেয়েলোকটাকে বাদল কোথায় জানি পুজোর ঘরে দেখেছে। হ্যাঁ, অমনি নীলের মধ্যে সাদা ফুটকি দেওয়া শাড়ি, আর সাদার ওপর মেটে দাগ দেওয়া শাঁখা কব্জিতে। বুকের খাঁজে অত জোরে খোকাটাকে চেপে ধরেছে। আহ্—ওর লাগছে। নিশ্চয়ই ওর লাগছে।

মেয়েটা বলল, বাবা আর একটা রিক্সা নাও না তুমি—

বুড়ো বিরক্ত হল।

—এদিকে আর রিক্সা কোথায় যে নেব? শুনছিস না গোলমাল লেগেছে? যে যার ঘর পালাতে পারলে বাঁচে এখন।

লরির জোড়া-চাকার নিচে ও তলার দিকে ঘেসের চাপড়া ছড়িয়ে পড়েছে। ড্রাইভার ঘুরে গিয়ে সিটের তলা থেকে কতকগুলো যন্ত্রপাতি বের করে নিল। গোলমালটা কেন, বাদল একবার তাই ভাববার চেষ্টা করল। মেয়েলোকটি যদি বুড়োকে খুঁজে না পেত, তাহলে ওকি ঘাবড়াত? ঝটপট ঝটপট শব্দ শুনে বাদল ওপরে তাকিয়ে দেখে তেঁতুল পাতার মত পাতাওয়ালা গাছটায় গোটাকতক কাক। গোলমাল বাড়ছে। আরো বাড়ছে।

সামনে কারা যেন পথ আটকাচ্ছে। গলিটা টপকে এসে বাদল দাঁড়াল। ওরা কাউকে যেতে দিচ্ছে না যে। যারা যচ্ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। কেন, ফেরাচ্ছে কেন সব লোককে। সামনে গোলমাল, তাই?

—এই ছোঁড়া, তুই কোথায় যাবি?

বাদল একটু আড়ালে দাঁড়াল। গাড়ি-বারান্দার থামের কোল ঘেঁসে। কলের পাইপের নোংরা ওর পায়ে লাগল। যারা রাস্তা আটকাচ্ছে তাদের মধ্যে ঐ হাওয়াই শার্ট গায়ে টাকমাথা লোকটাই মাতব্বর। ওরা সরকারী লোক না।

—কি ফ্যাসাদ হল বল দিকিনি।

দুজন লোক আসছে। এই দুজনকেও ফিরিয়ে দিয়েছে। ওরা বলাবলি করতে করতে বাদলের পাশ দিয়ে গেল।

—ওরা ভালর জন্যেই বলছে। ওদিকে অবস্থা খুব খারাপ—

—কি করবি এখন? রাতটা—

—বেণীরা কাছেই তো ছিল। ওরা কি বাসা পাল্টেছে?

হাওয়াই শার্ট এবার এদিকে আসছে। বাদলকে দেখতে পাবে। না, আর একটা লোক সামনে এসে পড়েছে হাওয়াই শার্টের। কি রকম গোঁয়ার-গোঁয়ার দেখতে লোকটাকে। কাপড়টা প্রায় হাঁটু অবধি, আর ফতুয়ার মত জামাটা এখানে-সেখানে ছেঁড়া।

—বলতে পারেন দত্ত প্রেসটা ফেলে এলাম কি—

হাওয়াই শার্ট কি বলল বাদল শুনতে পেল না। ও মাথা নাড়ল। হাত নেড়ে সামনের দিকে কি দেখাল।

গোঁয়ার লোকটা ফিরতে চাচ্ছে না।

—না না ছাড়ুন আমাকে, যেতেই হবে। আমার ভাই খবর পাঠিয়েছে জরুরি—

হাওয়াই শার্ট ওকে ধমকাচ্ছে। বাদল একটু পেছিয়ে আবার গলির ভেতর গিয়ে দাঁড়াল। বেশ হয় ও লোকটাকে যদি ফেরাতে না পারে হাওয়াই শার্ট। গোঁয়ার লোকটার সঙ্গে পারবে না ও। কি মোটা কি লোকটার…

দূরের সোরগোলটা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার। এক একবার বেড়ে উঠছে সেটা।

—এই বাচ্চা—

সেই বোতলওয়ালা বুড়ো।

—এই বাচ্চা, কোথায় হারিয়েছিলি ?

—ইস, তুমি তো হারিয়েছিলে।

ঘাড়ের বস্তাটা ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ করল। বুড়ো হাসল। ক্যাচ-ক্যাচ শব্দের সঙ্গে বুড়োর হাসি মিশে গেল।

—কিন্তু এরা যে বড্ড বেকায়দায় ফেললে রে, অ্যাঁ?—ভুরু টান করে বুড়ো।

বাদল বলল, ওরা কাউকে যেতে দিচ্ছে না।

বুড়ো বলল, হুঁ !

—দেখছ না, ওদের পেছন দিক রাস্তা কি রকম ফাঁকা ?

—তাই তো দেখছি !—ছুটো কালো দাঁত দেখা গেল বুড়োর। চিমটির মত ফাঁক হল ঠোঁট ছুটো। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, রাস্তা আছে, যেতে পারি। কিন্তু সে যে অনেক পথ রে !

গোঁয়ার লোকটা শেষে কোনদিকে গেল বাদল দেখতে পায় নি। হাওয়াই শার্ট ব্যস্ত। ওর মাথার টাকটা ঠিক বোঁটা-ছেঁড়া পানের মত। বাদল উসখুস করল।

—আসছে ! ওই লোকটা দেখতে পেলে—

বুড়ো বললে, কি করবে ?

—তাড়িয়ে দেবে।

—হুঁ, তাড়াবে।

বুড়ো ঠোঁট ওল্টাল। তারপর কিন্তু এক পা—ছু-পা করে পেচ্ছাবখানাটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বাদলও তাই করল। পেচ্ছাবখানার গায়ে খবরের কাগজ লাগানো। খানিকটা জায়গায় মোটা কালিতে চৌকো দাগ টানা। তার নিচে একটা মানুষের ছবি। ছবির মুখের ওপর আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল বাদল। কাগজ ছিঁড়ে ওর আঙুলটা বসে গেল। ছবির মানুষটার মুখ ইঞ্জিনের সামনেটার মত হয়ে গেল।

বাদল হাসল।

বুড়োর নিঃশ্বাস নেবার শব্দ হচ্ছে। নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে বুড়োর। সাবধানে নাক ঝাড়ল। ইঃ, কি বিচ্ছিরি গন্ধ এখানে ! গা ঘুলোয়।

বুড়ো মাথাটা ওপরে তুলে রাস্তা দেখে নিল একবার। রাস্তা ফাঁকা। ওর গলা ফিসফিস করল।

—ভয় পাস নি তো ?

—না।

—তোর বাড়ি কোথায় ?

বাদল বলল, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম। ওর মুখস্থ।

—বেলেঘাটা ?—বুড়ো চমকে উঠল : তবে এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

—আমি ময়দানে যাব। ময়দানে বাবা গিয়েছে। মিছিলের সঙ্গে বাবা—

—আস্তে, আস্তে। —বুড়োর গলা ফিসফিস করে, অত জোরে কথা বলিস না। …কিন্তু ওদিকে যে মারধোর হচ্ছে। হ্যাঁ ময়দানে। শুনছি তো তাই—

বুড়ো ছু-তিনবার সর্দি মুছল পেচ্ছাবখানার দেওয়ালে। কপালের ঠিক মাঝবরাবর ছায়া পড়েছে বুড়োর। বাদল রাস্তার মুখে ইলেকটিক বাতির দিকে তাকাল। আলোর বলটার চারদিক ঘিরে পোকা উড়ছে। এক ঝাঁক পোকা। কত পোকা, উঃ, কেউ কি গুনে বলতে পারে, কত ? ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট। ওদের সকলের প্রাণ আছে…। আচ্ছা সেই যে পাগলটা বসে বসে উহুন ধরাচ্ছিল, সে এখন কি করছে ? এ মিলিটারি ! দারোয়ান বলছে। দারোয়ান হাসছে হে হে হে করে।

খানিক বাদে বোতলওয়ালা বুড়ো দেওয়ালের পিছন থেকে বেরিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তার মুখ অবধি গেল। এদিক ওদিক দেখে নিল। বাদলকে ডাকছে। হাত নাড়ছে। কোথা থেকে মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ আসছে। দূর থেকে।

জনমানুষ একটাও নেই রাস্তায়। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। থমথমে।

—একলা ফিরে যেতে পারবি তো ?

বুড়ো ওর কাঁধে একটা ছোট ঠেলা দিল।

—এইচিস যখন যেতেও পারবি। কি, পারবি না ?

বাদল কোন কথা বলল না।

—রাস্তার মধ্যিখানে যাসনে কিন্তু বোকামি করে, পাশ দিয়ে দিয়ে যাবি সিধে রাস্তা। আর যদি কোন গোলমাল দেখিস—

ওকে ফিরে যেতে বলছে! হ্যাঁ ওকে ফিরে যেতে বলছে বুড়ো। যে পথে ও এসেছে, আবার সেই পথে। একটা রাগ বাদলের গলার মধ্যে যেন দলা পাকিয়ে উঠল। আমি ফিরব না। কিছুতে ফিরব না। মনে মনে বলল ও। বুড়োর কোঁচকান চোখ দুটোর দিকে তাকাল। মনে হল ও তাকে চেনে না! বুড়ো বোকার মত মিনিটখানেক চুপ করে থাকল।

—দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

—আমি ময়দানে যাব।

—বাড়ি যাবি না ?

—না।

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুড়ো। ওর চোখ দুটো দেখল। তারপর বলল, হুঁ, কাঁদনটা বুঝি বাকি আছে। তবে চল্—

ময়দানে সব মিছিল জড়ো হবে। চারদিক থেকে মিছিল আসবে। কত পথ কলকাতায়, গিজগিজে পথ, কিন্তু সব এক রকমের, সেই পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে মিছিলগুলো আসবে। গঙ্গার ওপার থেকে আসবে, কালীঘাট থেকে আসবে। ময়দানের ঘাসে সারা কলকাতার ধুলো। যত লোকের পায়ের ধুলোয় রাস্তাঘাটের গন্ধ। ময়দানের বাতাস তখন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বে ছুটোছুটি করে হাঁপাবে। কারণ বিস্তর নিশান দল বেঁধে এসে পড়েছে যে টকটকে জবা রঙের নিশান। নেমন্তন্নে এসেছে সব···

বুড়ো হাঁটা শুরু করেছে। বাদলও। থমথমে রাস্তায় ওদের দুজনের

পায়ের শব্দ উঠছে। দুটো মানুষ আর দুটো ছায়া চলেছে। এক একবার সামনে আসছে ছায়া দুটো। গোড়ায় খুব ছোট, তারপর খুব তাড়াতাড়ি ওদের ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে—অনেক লম্বা। আর ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। যেন এই মাত্র ওদের রক্ত কেউ শুষে নিল। সামনে আর একটা আলো কাছে এসে পড়লে, দুটো ছায়াই টপ করে লুকিয়ে পড়ে। না, ওরা তখন পিছনে। বুড়ো একবার তার বস্তাটা কাঁধ বদলে নিল। শিশি-বোতলের শব্দ হল। বাদলের মনে হল যেন অন্য ফুটপাথ থেকে, খানিক দূর থেকে এল শব্দটা। কতকগুলো খাওয়া ডাব ফুটপাথের কোলে ছড়ানো—তার ছায়াগুলো দেখে বাদলের গায়ের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। কতকগুলো মুণ্ডুর মত দেখাচ্ছে। মানুষের মুণ্ডু। একটা কাঠবিড়ালী ওদের সাড়া পেয়েই ছুটল। খাওয়া ডাবগুলোর ভেতর খাবার খুঁজছিল কাঠবিড়ালীটা। ছুটছে, ল্যাজটা যেন ফণিমনসার সরু ডাল, ঐ গাড়িবারান্দার ছকোনা থামগুলোর একটায় ওর বাসা নিশ্চয়।

হঠাৎ দুজনেই চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ ওই তো—গুম্ গুম্-ম্-ম্। রাস্তার দুধারে উঁচু বাড়িগুলোতে ধাক্কা খেতে লাগল। ধাক্কা খেতে খেতে দূরে চলে গেল আওয়াজ, আবার দূর থেকে ফিরে আসতে লাগল ছুটে ছুটে। নড়ছে, রাস্তাটা যেন দুলছে। অনেক দূরে থেকে এক সঙ্গে অনেকের চীৎকার ভেসে আসছে।

সামনে একটা বাঁধান অশথ গাছ, পাশ দিয়ে আর একটা সরু রাস্তা মিশেছে। গোল মত তিনটে পাথর বাঁধান জায়গাটায়। শোয়ান। জবা ফুলের পাপড়ি লেপ্টে রয়েছে, আর সিঁদুর।

—ওখানে কি হয়, পুজো ?

বুড়ো বাদলের কথা কানে নিল না। কাদের গলা পাচ্ছিল যেন ও। মানুষের গলা। বড় রাস্তার আলো ও রাস্তায় যতদূর ঢুকেছে—তারপরে তো আবছা। ভেতর দিকে একটুও আলো নেই।

—কিছু দেখতে পাচ্ছিস ?

—উঁ ?

—লোকের গলা শুনতে পাচ্ছিস না ? ওই তো।

একটা ঠেলাগাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। তার ওপাশে ওটা তো ডাস্টবিন। দেখাচ্ছে ঠিক একটা শেয়াল বসে রয়েছে। তারপর ?

হঠাৎ, অন্ধকার। খানিকটা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। চমকে উঠল। দুজনেই। চমকে উপর দিকে তাকাল।

—আলোটা নিবে গেল যে!

—যাঃ!—বুড়োর গলা কি রকম ফ্যাসফ্যাস করতে থাকে।

বাদল বলল, খারাপ হয়ে গেছে। হয় ওরকম—

কিন্তু তারপরেই পুট পুট করে নিবে যেতে লাগল রাস্তার আলোগুলো। কাছের—দূরের—আরো দূরের। আড়াল থেকে কে যেন কল টিপছে। একটার পর একটা।

অন্ধকার—কতদূর অবধি অন্ধকার। কটকটে অন্ধকার। ওরা যেন একটা মস্ত মালগাড়ির তলায় এসে পড়েছে।

কাদের কথা শোনা যাচ্ছে, পষ্ট এবার, খুব কাছে। বুড়ো ডাকল, বাচ্চা—। আস্তে ডাকল।

—এইতো আমি—বাদল ওর ফতুয়ার মত জামাটা একবার মুঠো করে ধরে ছেড়ে দিল: পা ঘসছ কেন, চলতে পারছ না—এইতো এদিকে—

হ্যাঁ, ওদের দেখা গেল। মাথা মুখ দেখতে পেল বাদল। মানুষগুলোকে, এক দঙ্গল লোক। বড় রাস্তা ছেড়ে কয়েক পা মাত্র এসেছে, ঠেলাগাড়িটা অবধিও না। তেকোনা বাড়িটার গা দিয়ে আর একটা রাস্তা রয়েছে, আরো সরু—কেমন করে যেন এইমাত্র বেরিয়ে পড়ল রাস্তাটা। বড় রাস্তা থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছিল না কিছু। রাস্তা বলে কি, সব এমনি কলকাতার। জট পাকানো। এলোমেলো আর জট পাকানো।

—জল, আরেকটু জল আনতে বলুন—মগটা খালি হয়ে গেছে—

ভীড়টার কাছে এল বাদল। আবছায় লোকগুলোকে এক রকম দেখায়। সব এক রকম। যারা কয়লার গাদায় কাজ করে, তাদেরও অমনি দেখায়। কালো, এবড়ো-খেবড়ো—কাঁধ, মুখ, পিঠ। অন্ধকারে মেশা। সবটা অন্ধকার না, আলো আছে একটু। দু-একজনের মুখে চুলে পড়েছে একটুখানি, সামনের ঐ নিচু দোকানঘরটার দরজা অল্প একটু ফাঁক করা। আলো আসছে। অন্ধকারের গা কেটে বেরোচ্ছে আলোটুকু।

—সরে দাঁড়াও না, আহ্—

বাদলের পাশে যেন কে বলল।

—সর সর—

একটু চেঁচিয়ে কে যেন বলছে, আরো জল আনতে বলুন—জল—

চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে দু-তিনটে লোক। আর রুমাল ভিজিয়ে চোখে ঘসছে। চোখে কি হয়েছে, বাদল অবাক হল। ভীড়ের মধ্যে আরেকটু সেঁধিয়ে এল বাদল। পরচুলার মত চুলওয়ালা একটা লোক আরো কে কে যেন কথা বলছে।

—মিছিল কি ভেঙে গেছে?

—জানি না।—চোখ মুছতে মুছতে মাথা নাড়ল লোকটা।

—কতদূর অবধি এগিয়েছিল?

—বুঝতে পারি নি।

—ওরা কি পালাচ্ছে?

লোকটা চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে নিল। বলল, পালাবে কোনখান দিয়ে?

—কেন?

—ওরা যে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। যারা গোড়ার দিকে পালিয়েছে, শুধু তারাই পালাতে পেরেছে। মিছিলের মধ্যে যারা ঢুকেছে, তারা আর বেরোতে পারে নি। পুলিশ গোড়া থেকেই তৈরি ছিল।

একটা লোক এক বালতি জল নিয়ে এল ভেতর থেকে। সবাই তাকে ঘিরে ধরল। রুমাল ভিজিয়ে নিচ্ছে। বালতিটা ছেঁড়াছেড়ি হচ্ছে। গ্যাস লেগেছে এদের। তাই জল দিচ্ছে চোখে। কারা যেন এইমাত্র বলাবলি করছিল বাদল শোনে।

আর একজন লোককে কজন মিলে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। ভীড়ের ভেতর থেকে বার করে নিল ওকে। থুতনিতে রক্ত আর মাটি লেগে রয়েছে লোকটার।

একজন জিজ্ঞেস করল, ওঁর বাড়ি কি কাছেই?

—ওরা চেনে।

—পালিয়ে আসতে পেরেছে এই খুব। কোথায় চোট লেগেছে?

—কোমরের হাড়ে লেগেছে, পাছায়, আরো অনেক জায়গায়—

—লাঠি লেগেছে?

—না।

—তবে ?

—লাইটপোস্টের ওপর থেকে পড়েছে শুনলাম—বেশ উঁচু—

—লাইটপোস্টে উঠতে গিয়েছিল কেন ?

—ফটো তুলবে বলে উঠেছিল। মিছিলের ফটো…

একটা শিস বাজল। শিস। একটানা খানিকক্ষণ। কোত্থেকে? দু-তিনটে বাড়ির ছাতের দিকে তাকাল বাদল। হঠাৎ দৌড়তে লাগল লোকগুলো। আসছে, আসছে। খুব কাছে মোটর গাড়ির আওয়াজ। হুড়মুড় করে একটা ভয়ানক ধাক্কা এসে পড়ল বাদলের ওপর। ছিটকে পড়ল। উঃ। বাদল চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ, আস্তে, চুপ।—কোমরে লেগেছে, বুকের হাড়ে। চোখে জল বেরিয়ে গেল বাদলের। খুব লেগেছে। হাঁপ নিতে কষ্ট। জোরে জোরে নিঃশ্বাস উঠছে। উঠছে আর নামছে। নিঃশ্বাস। বাদল চারধারে তাকাল। আরো কটা মুখ। এই নিচু ছাতওয়ালা ঘরটার ভেতর কতকগুলো বুক হাঁপাচ্ছে। নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। সেই দোকান-ঘরটা, না? আলো জ্বলছিল ভেতরে, কে একজন জল আনতে ভেতরে ঢুকেছিল; ঢুকেছিল, কিন্তু আসবার আগেই…উঃ, কানের ভেতর শিসের শব্দটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। চারদিকে বন্ধ। দরজা আটকানো। আর লোকগুলো হাঁপাচ্ছে।

কাঠের তক্তা চারদিকে। এটা কাঠের জিনিসের দোকান। পায়ের তলায় মচমচ করে ভাঙছে, ওগুলো কাঠের আঁশ। বাইরে থেকে এখন কোন শব্দ আসছে না। কোন শব্দ না।

বাদল আরেকটু সরে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। দেয়ালের গায়ে একটা খাড়া আলমারি। নতুন পালিশের গন্ধ। আয়না-বসানো আলমারির গায়ে ও নিজেকে দেখল। আমার পিছনে ঐ যে মুখ আর হাত-পাগুলো, ওগুলো কাদের? লম্বা ভাঙা তেরছা মুখগুলো? কাউকে চেনা যায় না। কাউকে না। ছবি কিন্তু অবিকল আসল মানুষটার মতন হয়। বোতলওয়ালা ওর ছেলেকে চিনতে পেরেছিল কাগজের ছবি দেখে।

হঠাৎ কি চড়ুই একটা চেঁচিয়ে উঠল? না চটকানো বেলুন—বাঁশি? ক্—হাঁ ক্—হাঁ আঁ—আঁ—। কান্না। বাচ্চা কাঁদছে। হ্যাঁ, ঘরের ভেতর। ভীষণ আশ্চর্য হল বাদল। ওরা কি করে এল? আয়নার ভেতরেই ও

দেখতে পাচ্ছিল। সেই বুড়ো, সেই মেয়েলোকটি, বুকে চ্যাপটানো বাচ্চাটা। মিছিল থেকে নেমে ওরা কোথায় গিয়েছিল? কোথা থেকে এল? নীলের ওপর সাদা ফুটকি-দেয়া শাড়ি মেয়েমানুষটির, আর বুড়োর চোখে চশমা—। দোলাচ্ছে খোকাটাকে। কাঁধের ওপর ফেলে দোলাচ্ছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটাটা থেবড়ে গেছে।

ক্—হাঁ ক্—হাঁ আঁ—আঁ—

বুড়োর গলার হাড় বিশ্রীভাবে নড়ল। চশমাটা একদিকে বেঁকে রয়েছে। বুড়ো মুখ বিশ্রী করে বলল, ওদিকে থার্মোফ্লাস্কটা অব্দি ফেলে আসা হল। এখন ওকে কি করে সামলাবি—উঃ জেনেশুনে এই হাঙ্গামার মধ্যে—

—বাবা!

—তুই তো খালি চুপ করতে বলিস। জানিস না তো কি সব কাণ্ড হচ্ছে—

গেঞ্জি-পরা একটা বেঁটে লোক ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। চাপা গলায় ধমকের সুরে বলল সে, চুপ করুন, আমাকে আর বিপদে ফেলবেন না আপনারা—

গজগজ করতে করতে ও একটা টুল টেনে রাখল ইলেকট্রিক আলোটার নিচে।

—বাইরে আওয়াজ গেলেই পুলিশ এসে দোকানের ওপর হামলা করবে। টুলে দাঁড়িয়ে গেঞ্জিপরা বেঁটে লোকটা আলোটা কাগজে মুড়ে দিল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ঘরটা। ঘরের সবটা আলো কে ছেঁকে নিল। ঐ কাগজটা।

কিছুক্ষণ কাটল।

বাদলের মনে হল, এই নিচু ছাতওয়ালা ঘরটার বাতাস ফুরিয়ে আসছে। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। হুড়কোটা খুব শক্ত করে আটকানো। বাদল একটু ঠেলল পাল্লাটা। একটা পাল্লার সঙ্গে আরেকটা যেন গেঁথে রয়েছে। কি শক্ত, খুলবে না, উঃ কী শক্ত!

—এই ওকি হচ্ছে, আরে আরে—

হঠাৎ একটা গলা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। চমকে উঠল।

—কি হল ?

—দরজা খুলছে। ওই ছোঁড়াটা—

—আঁ, কে?—গেঞ্জিপরা লোকটা, বুড়োকে আর বাচ্চা-কোলে মেয়েলোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে ঝাঁপিয়ে এল।

সবাই ওর দিকে তাকাচ্ছে। কটকট করে তাকাচ্ছে। ওকে ফুঁড়ছে। একটা শক্ত হাত ওকে টেনে আনল দরজার সামনে থেকে। গেঞ্জিপরা লোকটা ধমকে উঠল।

এদিকে এসে দাঁড়া। দরজা খুলছিলি কেন?

—আমি বাইরে যাব।

—কি বললি?

—বাইরে যাব আমি। আমাকে খুলে দাও। খুলে দাও বলছি—কে যেন ঘড়ঘড় করে বাদলের গলা দিয়ে বললে।

—একটা থাবড়া মারুন না ছোঁড়াকে। খুলে দাও! আবদার পেয়েছে!

বুড়োটা হাঁ করে রয়েছে। চশমা আরো ঝুলে গেছে। আর একজন বলল, আমাদের শুদ্ধু মজাবে। বেঁটে লোকটা তখনো ওর হাত চেপে রয়েছে। ঝটকা মেরে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল বাদল। উঃ, কি শক্ত! ওর কব্জিতে দাঁত বসিয়ে দিতে গেল বাদল। লোকটা অন্য হাতে ওর ঘাড় চেপে ধরেছে এবার।

—উঃ, বাইরে যাবি, বাইরে যাবি তুই, না?—চোয়ালে শক্ত খাঁজ পড়ল লোকটার: বেশ চল, দিচ্ছি তোকে বাইরে বার করে।

লোকগুলো একটাও কথা বলল না।

লোকগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল শুধু। গেঞ্জিপরা বেঁটে লোকটা বাদলকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আলমারির সামনে দিয়ে যাবার সময় ছায়াটা দেখল বাদল। ছায়া। আমি না আমি। না। ভাঙা বালতির তলার মত তোবড়ানো মুখ। ছেঁড়া কোষ্ঠার চুল। মরা মাছির মত চোখ। ও আমি না।

ভেতরের দরজাটা আরো নিচু। বেরোবার সময় দরজার লোহায় ওর প্যাণ্ট আটকাল। ছিঁড়ল। বেঁটে লোকটা ওকে ঠেলছে। বেরিয়েও ঠেলতে লাগল। কেমন ঘোর-ঘোর লাগল বাদলের। আবছায়া। কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে—যেন মস্ত এক গোলকধাঁধার ভেতরে কতক্ষণ পাক খেল—সিঁড়ি, দালান, চাতাল-ওলা নিচু ঘরের গোলকধাঁধা। শেষে একটা

পাঁচিলের পেছনের দরজা দিয়ে সত্যিই ওকে বাইরে বের করে দিল সেই বেঁটে লোকটা।

ওরা কি আমার কথা বলছে? আমায় বকছে? ওরা কি সারা রাত্তির থাকবে? ওই ঘরের ভেতর লোকগুলো জমে থাকবে? মেয়েলোকটির কোলের খোকাটা কাঁদবে চড়ুইপাখির ছানার মত? সকাল হলেই ওরা আমার কথা ভুলে যাবে। হ্যাঁ, সকাল হলে। ভুললই বা, কী তাতে? আমি তো ওদের চিনি না। আমিও ওদের আর খুঁজব না। আমি বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি। বাবাকে।

গাঢ় কালির মতন থকথকে অন্ধকার। পিছনে দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। গেঞ্জিপরা বেঁটে লোকটা ওকে বাইরে ঠেলে দিয়েই বন্ধ করে দিল। বাইরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাচ্ করে খানিক কাদা ও গা-খোলানো গন্ধ বাদলের হাঁটু অবধি লাফিয়ে ওঠে। কাদার স্যাঁতসেতে জিব ওর পা-দুটো লেপ্টে ধরল। বাদল সামনে হাত বাড়াল। দেয়াল। ও পিছনে সরতে সরতে ধাক্কা খেল। দেয়াল। এটা গলি না, একটা ফাটল। দেয়ালের ফাটল একটা। কিন্তু ঐ যে তারা ওপরে—তারা দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর আকাশ। বেড়ালের লোমের মতন মেঘ একটুখানি। হাত বাড়িয়ে ছোঁব? ও জোরে নিঃশ্বাস টানতে গেল। গন্ধ—ওয়াক্। গা ঘুলিয়ে উঠল বাদলের।

কাদায় পা চেপে চেপে বাদল এগোতে লাগল। কাদা। ভেতরে খোয়া উঁচু হয়ে রয়েছে। এবড়ো-খেবড়ো। খোয়াগুলো ছুরির মত পায়ের তলায় লাগছে। দেয়াল না থাকলে কাদায় পড়ে যেতাম। আছাড় খেতাম। প্যাণ্টের যেখানটা ছিঁড়েছিল, সেখানটা জলছে। চামড়া ছিঁড়ে গেছে। তারা। আগে তিনটে ছিল, এখন চারটে। চারটে তারা এক লাইনে।

বাদল দেয়াল ধরে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। এ গলি শেষ হবে না। গলি না, ফাটল, অন্ধকার এবড়ো-খেবড়ো অদ্ভুত ফাটল একটা। এ-জন্মে শেষ হবে না। কোনদিন···ও যেন অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে—হাঁটছে—

ওকি,—ওর বুকটা ধড়াস্ করে উঠল।

গুম্! গুম্-ম্-ম্-ম্—!

দেয়াল থরথর করছে। কাছে। এই দেয়ালটার ওদিকে কারা যেন

চীৎকার করছে। ভীষণ চীৎকার করছে। ও কারা? এবড়ো-খেবড়ো ইটের কোণ ধরে ধরে বাদল তাড়াতাড়ি এগোতে চাইল। আরো তাড়াতাড়ি।

উঃ, আর পারি না, আর পারি না, বাবা গো! কোথা থেকে এত ঝাঁঝালো গন্ধটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। নিঃশ্বাস আটকে আসছে। চোখ জ্বলছে। যেন ছুঁচ ফুটছে। উঃ। দুবার হোঁচট খেল বাদল। ইটগুলোর গায়ে গুঁড়ো গুড়ো, তারপর গর্ত। গর্তের পর আবার ইট। আবার গর্ত।…

এবার থেকে আমি তোমার কথা শুনব। দেখো শুনব। বৃষ্টিতে ভিজে তোমার জর হলে আমি সারা দিন তোমার কাছে থাকব। মাথা টিপে দোব। পা টিপব। বার্লির বাটিতে নেবু নিঙড়ে দোব মার মত করে।

—বাবা—বাদল আস্তে একবার ডাকল।

কি?—

কোথা থেকে উত্তর এল যেন। বাদল চমকাল। অন্য কেউ? না, ও তো বাবার গলা।

—বাবা, আরেকটু জোরে ডাকল বাদল।

—কি?

না না না। বাদল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কেউ না। ফাঁকি, মিথ্যে শব্দ। অন্ধকার শয়তানি করছে। ইস্, আমাকে আর ফাঁদে ফেলতে হয় না।

তুমি কেন চলে গেলে? কেন না বলে গেলে? কেন? বেশ, আমি যাব না, তোমার কাছে যাব না। আমি তোমাকে ভালবাসি না। বাসি না। উঃ জ্বলে যাচ্ছে। চোখ-নাক-মুখ জ্বলে যাচ্ছে। কাটা জায়গাটা জ্বলছে। পায়ে চটচটে কাদার জিবগুলো শুকিয়ে টেনে ধরেছে। পা ভেঙে আসছে। আর পারি না আমি।

…বাদু পুজো আসছে, তোর কি রকম জুতো হবে বল দিকিনি…

…বাদু বড় বজ্জাত হয়েছিস তুই। আমার ছাতার শিক ভাঙল কে শুনি…

…ধারাপাত নিয়ে এখানে বোস তো বাদু। আটের ঘরের নামতা তো মুখস্থ হয় নি। ইস, পাতাগুলো কি চিবিয়েছিস নাকি?…

আমি আদর চাই না। তুমি মিষ্টি করে ডাকলেও আমি যাব না। গাল দাও তুমি, খুব করে আমাকে গাল দাও—

গর্ত…গর্ত…ইট। শেষ হবে না, এই রাক্কোসের দাঁতগুলো শেষ হবে না। দেয়াল না, এটা যেন একটা মস্ত করাত। করাতটা কলকাতাকে দুভাগ করে রেখেছে। তার একদিকে দলা দলা অন্ধকার। আমি বাদল আরেক দিকে? কি, তা জানি না। ওই, আবার শব্দ হচ্ছে। আর একদিকে ঐ ভয়ানক শব্দগুলো। চীৎকারের ছুরিগুলো। পাগলের মত আছড়াচ্ছে।

আমি একদিন মিছিলের সঙ্গে চলে যাব। সরকার বাগানের পেছন দিয়ে পালাব, কেউ জানবে না কোথায় গিয়েছি। মা ভাববে লাইনে মাল বদলাচ্ছে গাড়ির, আমি বুঝি সেখানে। দেখো, ঠিক তোমাকে খুঁজতে হবে। আমি অনেক দূর যাব, অনেক দূর। হেঁটে হেঁটে তোমার কোমর ব্যথা করবে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে, কিন্তু তখনো আমি কোথায়!

হঠাৎ কি যেন হল।

শব্দ আর চীৎকার একশো গুণ, হাজার গুণ হয়ে উঠল হঠাৎ। ও কারা? দাপাদাপি। ছুটোছুটি। গোঙানি। কারা দাপাদাপি আর ছুটোছুটি করছে? কারা গোঙাচ্ছে? কারা? একপাল খ্যাপা মোষ কি গোঙানিগুলোকে ঠেলাচ্ছে? বাদল আঁকড়ে ধরতে গেল দেয়ালটা। কোথায় দেয়াল? দেয়াল থেকে সরে গেছে। ইটের দাঁতগুলো হারিয়ে গেছে। ফাটলের মত পৃথিবীটা টুকরো টুকরো। কোথায় এলাম? রাস্তা? মাটি থরথর করছে। দুলছে, টলছে। পেটের ভেতর ঘুলিয়ে উঠছে। বমি আসছে। চোখ মেলতে পারছি না, গুঁড়ো গুঁড়ো ছুঁচ, ছুঁচের ধোঁয়া, ধোঁয়া-নিঃশ্বাস নেই, হাওয়া যেন লোহার বস্তা। আমায় চেপে ধরেছে—। ঠেলছি। বুক দিয়ে। বুক দিয়ে—।

কেউ ওকে ধাক্কা দিল, আর বাদল উল্টে পড়ল আচমকা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পেটের তলায় কি যেন ঠাণ্ডা লাগল। ঠাণ্ডা, কি এটা—পুলের রেলিং? ভেঙে নিয়ে নীচে পড়তে লাগল, ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগল বাদল। ধোঁয়া—ধোঁয়ার ঝুঁটি ঝাপটে ধরতে গেল ও, পারল না। একটা ইঞ্জিনের চোঙার ভেতর দিয়ে নেমে যাচ্ছে। নীচে—নীচে। গনগনে আগুন—

চারদিক থেকে আগুনের চাঙড়া খসে খসে পড়ছে। আগুনের ভেতর দিয়ে একটা কি গড়িয়ে এল ওর দিকে। ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক। চাকা—চাকার খাঁজের ভেতর গনগনে লাল শাবলের জিবগুলো একবার বেরিয়ে আসছে, আবার ঢুকে যাচ্ছে। লক লক করছে। এগিয়ে আসছে। চাকাটা ওকে ধরতে আসছে। ধরবে।···

ধর, আমি যদি এক্ষুনি এই রাস্তাটা হয়ে যাই ? হ্যাঁ এখন আমি এই রাস্তা। টান-টান হয়ে পড়ে রয়েছি। সোজা, কোথাও এবড়ো-খেবড়ো, খামচানো। রুখু, কটকটে, ট্রামলাইনের মধ্যেখানে ইটের ফাঁক, খোলা কলে ঝর ঝর ঝর ঝর শব্দ। আমি রাস্তা। দিনরাত শুধু পড়ে পড়ে আকাশ দেখা—আর তো কোন কাজ নেই। পালকের ঝাড়ুর মত মেঘ, আর ইলেকট্রিক তারে ঘুড়ি আটকে রয়েছে—ছেঁড়া, এক একবার বাতাস বজ্জাতি করে ওটাকে উল্টে দিয়ে যাচ্ছে চিৎ করে। কলকাতার রাস্তাগুলো সব একরকম—না ওরা সবাই মিলে একটা। একটাই। এতবড় কলকাতাকে আমি ছুঁয়ে রয়েছি। রেলপুলের ওধারে টিনের ছেঁচতোলা বস্তির ঘর ছুঁয়ে রয়েছি। ময়দান ছুঁয়ে রয়েছি। আমার ওপর দিয়ে মিছিল গেল। পাতার টুপি পরা পাগলটা গেল। একটা খাওয়া ডাব শুট করল ও। তারপর সেই বোতলওয়ালা বুড়ো। এখনো পা টানছে, হোঁচট খাচ্ছে। কতবার সর্দি মুছল তার ঠিক নেই। ···কোথায় যেন গোলমাল লেগেছে ; কেউ ছুটছে কেউ হকচকিয়ে গিয়েছে। একটা খোকা কাঁদছে। গোলমাল চলেছে। বাড়ছে। কত লোক, কত লোক। এত হিজিবিজির মধ্যে একজন আরেকজনকে কি করে খুঁজে পাবে ! আচ্ছা তোমরা কেউ একটা ছেলেকে দেখেছ—তার প্যাণ্টুল তলার দিক সেলাই ছেঁড়া, আর এই কানের নীচে একটা দাগ আছে ছুরিতে কেটেছিল, খুব ছুটতে পারে···

আহ্।

অন্ধকার হয়ে গেল।

সব অন্ধকার। সমস্ত।

অন্ধকার আমায় আটকে ফেলল। বন্ধ। ডান দিকে। বাঁ-দিকে। চারদিকে—। কবাট। খুলে দাও বলছি। একটা শিস রী রী করছে। অন্ধকারের চাঙড়াগুলো ভয়ের মুখ। শিরীষ গাছ, চারটে তারা পোয়ানো মত ডাস্টবিন থেঁতলে একসঙ্গে দলা পাকিয়ে আছে। ঐ মুখগুলো। ওরা

কারা ? চিনি না। খোল—ও ঠেলছে—কী ভারি অন্ধকারের পাল্লা দুটো, নড়ল না, একটুও না, দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। শক্ত, উঃ কী শক্ত !

কে যেন ডাকল। ডাকছে।

বাদ্দ—বাদ্দ—বাদ্দ উ উ উ—

ওইতো ! বাবা ডাকছে। বাবা !

—এই যে আমি—

বাদল চেঁচিয়ে সাড়া দিতে গেল। গলায় কি যেন ঠেলে উঠে আওয়াজটা চেপে ধরল। বাবা কি শুনতে পেল ?

—বাদ্—বা-দ-ল—

—এই-যে—আ-মি—

বাবা। অন্ধকারে বাবা ওর হাত ধরল।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

সোভিয়েত বিজ্ঞান

বইটির নাম 'সোভিয়েত বিজ্ঞানের গোপন কথা'। লেখক একজন ফরাসী সাংবাদিক, নাম লুসিয়ঁ বানিয়ের। বইটি পড়লে বোঝা যাবে, একজন বিদেশী সাংবাদিকের পক্ষে সোভিয়েত বিজ্ঞানের গোপন কথা লেখা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে সোভিয়েত দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো গোপনীয়তা নেই। লেখক নিজেও এই কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং এর সপক্ষে অনেক দৃষ্টান্তও হাজির করেছেন। কিন্তু লেখকের কথা বাদ দিলেও এই বইটিই এই উক্তির সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত। লেখক বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও যত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, যত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়েছেন এবং যত কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন—বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোথাও কোনো রকম গোপনীয়তা থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হত না।

গোপনীয়তা যে নেই তার আরো একটি প্রমাণ, সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের লেখা অজস্র ছাপার হরফের বই। অতি সামান্য মূল্যে এ-সমস্ত বই বিক্রি হয় আর তাতে এমন সমস্ত খবর থাকে যা সোভিয়েত দেশের বাইরে অন্য যে-কোনো দেশেই 'চূড়ান্ত গোপনীয়' ফাইলের বাইরে পাওয়া সম্ভব নয়। লেখকের নিজের ভাষায়—"আমি নিজে মস্কোর একটি বইয়ের দোকান থেকে ২'৮৫ রুবল দিয়ে ১৮০-পৃষ্ঠার একটি বই কিনেছিলাম। এই বইটিতে স্পুৎনিক সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত খবর দেওয়া আছে। বইটিতে যে-সমস্ত মানচিত্র আছে তাতে স্পুৎনিকের গতিপথের ছবি পাওয়া যায়। এমনকি, কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর-পূর্ব দিকের যে ঘাঁটি থেকে স্পুৎনিককে আকাশে তোলা হয়েছে তাও মানচিত্রে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়। হালে আমি একটি বই কিনেছি; পৃথিবীর অন্য যে-কোনো জায়গা হলে এই বইটির আষ্টেপৃষ্ঠে 'গোপনীয়', 'চূড়ান্ত গোপনীয়' ইত্যাদি ছাপ পড়ত।

* Secrets of Soviet Science—Lucien Barnier; Rupa & Co. Rs. 3·00.

বইটির প্রকাশক খোদ সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-দপ্তর। বইটিতে 'বিমান-চালনায় পারমাণবিক ইঞ্জিনের প্রয়োগ' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে সমস্ত রকমের পারমাণবিক চুল্লির নক্শা দেওয়া হয়েছে যা বৃহদাকার বিমানের পক্ষে উপযোগী।" (পৃঃ ১৯৯)

সোভিয়েত বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও সাফল্য সম্পর্কে আজ আর কোনো মহলেই দ্বিমত নেই। যে-দেশে অল্প কিছুকাল আগেও এমনকি অপেরা-গ্লাস পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত সেখানে এখন মস্ত মস্ত মানমন্দিরে টেলিস্কোপ রাডার ও ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের ছড়াছড়ি। যে-দেশে অল্প কিছুকাল আগেও যানবাহন বলতে ছিল ঘোড়ায় টানা গাড়ি সেখানে এখন ২০০ যাত্রীবাহী টি. ইউ.-১১৪ জেট-বিমান ঘণ্টায় ছ-শো মাইল বেগে স্ট্রাটোস্ফিয়ার দিয়ে উড়ছে। যে-দেশে অল্প-কিছুকাল আগেও তেলের বাতি টিমটিম করত সেখানে এখন ৩২,০০,০০০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য ব্যাপারটি কি করে ঘটতে পারল তার কারণও এই বইয়ের লেখক তলিয়ে দেখেছেন।

কারণ একাধিক এবং একটির সঙ্গে অপরটি সম্পর্কযুক্ত। তবে এমন ধারণা যদি কারও থাকে যে সোভিয়েত দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্র-শিল্পের উন্নয়নের দিকেই সমস্ত রাষ্ট্রীয় মনোযোগ ও সামর্থ্য নিবদ্ধ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড না থাকার মতো, তবে তার জবাবে লেখকের বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতেই তুলে ধরছি: "ঘটনা দেখে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর সংখ্যক বাসাবাড়ি তৈরি হচ্ছে, শহর ও গ্রাম গড়ে তোলা হচ্ছে, খাল কাটা হচ্ছে, রেললাইন পাতা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করা হচ্ছে, হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার-স্টেশনের পত্তন হচ্ছে। একমাত্র ১৯৫৭ সালেই ৮০০ বৃহৎ শিল্পসংস্থার কাজ শুরু হয়েছে; পাইপ লাইন, রোলিং মিল ও চারটি বৃহৎ স্মেল্টিং কারখানা জাতীয় উদ্যোগের অঙ্গীভূত হয়েছে। ত্রিশটি নতুন টেলিভিশন স্টেশনের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে। ১৯৫৭ সালে শিল্পজাত উৎপাদনের মোট বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা দশ ভাগ। ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ছয় ভাগ। বেতন ও

মজুরির বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা সাত ভাগ। চাষীদের আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা পাঁচ ভাগ। সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে ১৬৮০ কোটি রুবল বেশি।" (পৃঃ ১৯৫)

তাহলে সোভিয়েত বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য সাফল্যের কারণ কি?

লেখকের মতে গোড়ার কারণটি খুঁজতে হবে সোভিয়েত দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের মধ্যেই। প্রতি বছরেই বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই খুবই অল্পবয়স্ক। যেমন এঁদের নিষ্ঠার একাগ্রতা, তেমনি কল্পনার বলিষ্ঠতা। 'অসম্ভব' কথাটা এঁদের অভিধানে নেই। যেমন, এক সময়ে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যে মস্কোর সঙ্গে পিকিঙ-এর সরাসরি রেলপথের যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা কাজে লেগে গিয়েছিলেন। এজন্যে ৭১০ মাইল লম্বা নতুন রাস্তা করতে হয়েছিল, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ—তা সত্ত্বেও তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়েছে। ওদিকে প্রায় একই সঙ্গে পারমাণবিক তেজের সাহায্যে ইঞ্জিন চালাবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। হিসেব করে দেখা হয়েছে যে মাত্র সাড়ে-তিন আউন্স ইউরেনিয়াম খরচ করেই পারমাণবিক ইঞ্জিন মস্কো থেকে পিকিঙ পাড়ি দিতে পারবে। আরেকজন বিজ্ঞানী পরিকল্পনা করেছেন যে পারমাণবিক তেজের সাহায্যে চালিত কয়েক-শো পাম্পের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ জল উত্তর মহাসাগরের জমাট জলের মধ্যে এমন ভাবে চালান করতে হবে যাতে উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার জলহাওয়া পাল্টে যায়। আরেকজন বিজ্ঞানীর পরিকল্পনা আরো বেশি দুঃসাহসিক। তিনি হিমালয় পর্বতের ওপর দিয়ে রেললাইন পেতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত ও চীনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চান। এমনি সব পরিকল্পনা অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এ-সমস্ত পরিকল্পনা অলস মস্তিষ্কের আকাশকুসুম-কল্পনা নয়, মাপজোক আর নক্শার কষ্টিপাথরে যাচাই করা বাস্তব ব্লু-প্রিন্ট। আর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ-ধরনের ভাবনাকে উৎসাহিত করা হয় বলে সোভিয়েত মানুষের মধ্যে এক নতুন ধরনের সাড়া জেগেছে। সকলেই আরো কিছু করতে চায়, আরো বড়ো হতে চায়। সারা দেশ জুড়ে যেন প্রাণের মহোৎসব চলেছে। এই প্রসঙ্গে লেখক একটি মেয়ের কথা বলেছেন। মেয়েটি বছর দুয়েক আগে মস্কোর জিও-ম্যাগ্নেটিজম্ ইনস্টিটিউটে চুল্লী পরিষ্কার

করার কাজে ঢুকেছিল। মাত্র দু-বছরের মধ্যেই সে অসিলোগ্রাফের রীডিং নিয়ে আয়োনোস্ফিয়ারের নড়াচড়ার হিসেব রাখতে শিখেছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক তারপরে চোখ ফিরিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের দিকে। সোভিয়েত দেশে গবেষণা-কেন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োগ-কেন্দ্রের এমন একটা নিবিড় ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যে বিজ্ঞানী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন তাঁর উদ্ভাবনা কতখানি কার্যকরী হয়েছে। আর কোথাও কোনো রেষারেষি ও গোপনীয়তা নেই বলে কোনো একটি বিশেষ কেন্দ্রের কোনো একটি বিশেষ সাফল্য অচিরেই গোটা দেশের সাধারণ সাফল্য হয়ে ওঠে। এই সাফল্য যে কত ব্যাপক ও বিপুল সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণা এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে: "১৯৫৭ সালে শিল্পের ক্ষেত্রে সাফল্যের একটি তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে। এই তালিকায় যানবাহন বা তেজ-উৎপাদন বা কৃষিকার্য বা এ-ধরনের অন্যান্য উদ্যোগের হিসেব ধরা হয়নি। যন্ত্রনির্মাণ সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্যোগে দেড় হাজারেরও বেশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে। শিল্পোদ্যোগগুলিতে সাড়ে-তিন শতেরও বেশি নতুন ধরনের মেকানিকাল ইঞ্জিন প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদন হচ্ছে। জাতীয় উদ্যোগগুলিতে পনেরো লক্ষেরও বেশি আবিষ্কার ও উন্নয়নসূচক যান্ত্রিক উদ্ভাবনার প্রয়োগ হয়েছে এবং তার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে ৭০০ কোটি রুবল খরচ বেঁচেছে।" (পৃঃ ১৯৬)।

অল্প কয়েকটি লইনে বলা এক বছরের এই হিসেবটি নিশ্চয়ই আমাদের অনভ্যস্ত কানে অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

তবে এক বছরে পনেরো লক্ষাধিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হবার কথা শুনে আমরা যদি এই ধারণা করে বসি যে সোভিয়েত দেশের মানুষরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞানী তাহলে কিন্তু ভুল হবে। ১৯৫৭ সালে মোট ,৭২,৫০০ ছাত্রছাত্রী স্নাতক হয়েছিল—তার মধ্যে ৭০,৫০০ ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের, বাকিরা থিয়েটার সঙ্গীত সিনেমা ও অন্যান্য শাখার। তবে একথাও ঠিক যে সোভিয়েত সেকেণ্ডারি স্কুলগুলোতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই বাধ্যতামূলক ভাবে রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা পড়তে হয় আর সোভিয়েত দেশে ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সংখ্যা বছরে বছরে বেড়ে চলেছে। ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০ আর

প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর পরিমাণ ছিল বছরে খবরের কাগজের সাইজের ২৯,০০০ পৃষ্ঠা।

এ-প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যার দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মধ্যে একটি তুলনা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা (হাজারকে একক ধরে)

	১৯৫০	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৫৭
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩৬	৫৬	৬৬	৭১	৮০
যুক্তরাষ্ট্র	৫৩	২২	২৩	২৬	২৯

ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা (প্রতি ১০ লক্ষ মানুষে)

	১৯৫০	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৯৯	২৮৯	৩৩৪	৩৫৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৯	১৩৬	১৩৯	১৫৫

এই তুলনামূলক হিসেব এতই স্পষ্ট যে এর পরে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না কেন বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বইটিতে ন'টি পরিচ্ছেদ আছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানের আশ্চর্য সা সাফল্যের বিবরণ আছে এই পরিচ্ছেদগুলোতে। টেক্‌নিকাল আলোচনা নয়, বিবরণ। কাজেই বইটি স্বচ্ছন্দে এক নিশ্বাসে পড়ে যাওয়া চলে। আর তারপরে যখন টুকরো টুকরো খবরগুলো একসঙ্গে মিলে গিয়ে পুরো একটা ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বিজ্ঞান যে গোটা একটা দেশের চেহারা এমনভাবে পাল্‌টে দিতে পারে তা যেন ভাবা যায় না। এই প্রসঙ্গে সেই পুরনো গল্পের উপমাটাকেও খেলো বলে মনে হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞান আলাদীনের প্রদীপকেও হার মানিয়েছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানের আলোচনায় স্পুৎনিক সম্পর্কিত খবর অবশ্যই থাকবে। এই বইতেও আছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এ-বইয়ের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা বিদ্যুৎ ও তেজ উৎপাদন সম্পর্কে এবং যানবাহন সম্পর্কে। লেখক নিজেও নভোচারণা-সম্পর্কিত আলোচনার চেয়েও এই দুটি বিষয়ের আলোচনায় বেশি পৃষ্ঠা খরচ করেছেন। ফলে এই বইটি পড়া

পরে সোভিয়েত বিজ্ঞানের সামগ্রিক তাৎপর্য ও পরিপ্রেক্ষিতটি যেন আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।

সোভিয়েত দেশে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কর্মকাণ্ডটি দু-দিকে শেকড় মেলেছে। হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি ও পারমাণবিক পাওয়ার স্টেশন। কুইবুইশেভ জলবিদ্যুৎ স্টেশনটির কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। একনম্বর স্পুৎনিকটি আকাশে তোলার দশদিন পরে এই স্টেশনের বারো নম্বর টারবাইনটি চালু হয়েছে। ফলে এখানকার বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১,০০,০০০ কিলোওয়াট। এটিই বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ স্টেশন। এতকাল পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ-স্টেশন ছিল আমেরিকায় (১৯,৭৪,০০০ কিলোওয়াট)। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আমেরিকা হার মেনেছে।

কিন্তু এই বইয়ের বিবরণ পড়ে বোঝা যায় যে অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েত দেশের অন্যান্য নির্মীয়মান জলবিদ্যুৎ-স্টেশনের কাছে কুইবুইশেভ জলবিদ্যুৎ-স্টেশনটিও হার মানবে। সাইবেরিয়ার আঙ্গারা নদীতে তৈরি হচ্ছে ব্রাৎস্ক হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার-স্টেশন। সেখানে কুইবুইশেভের চেয়েও প্রায় সাতগুণ বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এই বইয়ের বিবরণ থেকে আরো জানা যায় ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত দেশে নির্মীয়মান পাওয়া-স্টেশনের সংখ্যা ছিল ১৪২টি।

সোভিয়েত দেশে প্রথম পারমাণবিক পাওয়ার-স্টেশন তৈরি হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫,০০০ কিলোওয়াট। কিন্তু পরবর্তী যে পারমাণবিক পাওয়ার-স্টেশনটি তৈরি হচ্ছে সেখানে ৪,২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।

সোভিয়েত দেশে পারমাণবিক তেজ নিয়ে যে বিপুল গবেষণা চলেছে তার কিছু বিবরণ এই বইয়ে পাওয়া যাবে। পারমাণবিক গবেষণার জন্যে মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে দুব্‌নো নদীর ধারে মস্ত একটি শহর গড়ে তোলা হয়েছে, লেখক রহস্যচ্ছলে যার নাম দিয়েছেন 'অ্যাটমগ্রাদ'। এই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ইউনিফায়েড ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার রিসার্চ'। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশের বিজ্ঞানীরা এসে এখানে মিলিত হন পারমাণবিক গবেষণার জন্যে।

সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়েন্সেস্-এর সভাপতি এ. নেস্‌মিয়ানভ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন : "আমরা পারমাণবিক যুগের মধ্যে এসে

দাঁড়িয়েছি। এই যুগের মধ্যেই আমাদের থাকতে হচ্ছে ও কাজ করতে হচ্ছে। কাজেই এখন আর আমাদের পুরনো টেক্‌নিকাল ধারণাগুলোকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না। আমাদের এই গ্রহে সৌরতেজের যতোটুকু অংশ কোনো না কোনো উপায়ে আটক পড়ে তা সূর্যের সুবিপুল তেজ-ভাণ্ডারের নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর অংশ। এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া চলে না। এখন সময় এসেছে—এই পৃথিবীতে আমরা একটা নিজস্ব সূর্য বানিয়ে নেব।" (পৃঃ ৩১)।

এই বক্তৃতা কথার কথা নয়। এই বইয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এ-কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। তিনটি পর্বে কাজটিকে ভাগ করা হয়েছে: (১) পারমাণবিক পাওয়ার-স্টেশনের পত্তন, (২) পারমাণবিক জাহাজ তৈরি (১৯৫৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর 'লেনিন' নামে পারমাণবিক তেজে চালিত একটি বরফ-কাটা জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছে), (৩) বিমান-চালনায় পারমাণবিক তেজের ব্যবহার। আর এই তিনটি পর্বেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছেন।

সোভিয়েত জেট-বিমান টি. ইউ—১১৪ সম্ভবত জেট-বিমানের ক্ষেত্রে উন্নতির শেষ ধাপ। কাজেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এবারে নজর দিয়েছেন রকেট-চালিত বিমানের দিকে, ফোটোন রকেটের দিকে এবং আরো অনেক কিছুর দিকে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধারণা, আর কয়েক বছরের মধ্যে মস্কো থেকে নিউইয়র্কে পৌছতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

শুধু আকাশপথেই নয়, স্থলপথের ও জলপথের যাত্রাও অনেক বেশি ত্বরান্বিত হচ্ছে। পারমাণবিক তেজে চালিত ইঞ্জিনের কথা আগেই বলেছি। ওদিকে জলপথে নতুন এক ধরনের ডানাওলা জাহাজ চালু হয়েছে। সত্তরজন যাত্রী সমেত এই জাহাজ প্রায় উড়ন্ত অবস্থায় জলের সঙ্গে সামান্য একটু ছোঁয়া মাত্র বজায় রেখে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটবে। কিন্তু এই প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও জল কিছুমাত্র তোলপাড় হবে না আর ঢেউয়ের ধাক্কায় নদী ও খালের পাড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এই বইয়ে একটি ছোট পরিচ্ছেদ আছে ইলেকট্রনিক ব্রেন সম্পর্কে। ইলেকট্রনিক ব্রেন বা ইলেকট্রনিক কম্পিউটর যা আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। যে অঙ্ক কষতে একজন মানুষের ৩০,০০০ ঘণ্টা লাগে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে একঘণ্টায় করা চলে। হালে এই যন্ত্রের সাহায্যে

...লের কাজও করা হচ্ছে। ইংরাজী, জার্মান, চীনা, জাপানী ও ফরাসী ... থেকে রুশ ভাষায় বা রুশ ভাষা থেকে অন্য যে-কোনো একটি ভাষায় ... যে-কোনো একটি ভাষা থেকে অন্য যে-কোনো একটি ভাষায়।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের বহুমুখী তৎপরতার আরো নানাদিকের বিবরণ ... বইয়ে পাওয়া যাবে। আবহতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের গবেষণা কি-ভাবে দেশের ...কে পালটে দিচ্ছে, মেরু অঞ্চলের গবেষণা কী উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ... করে তুলছে, প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে ওপারিনের গবেষণা কোন্ ... দিগন্তকে উন্মোচিত করছে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে অজস্র তথ্যে বইটি ...। বইটি পড়লে শুধু যে সোভিয়েত বিজ্ঞানের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ... যায় তাই নয়—এই গ্রহের মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও যেন খানিকটা ... করা চলে। এমন একটি মূল্যবান বইয়ের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করে ... কোম্পানী ইংরাজী-জানা ভারতীয় পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ...র বাংলা অনুবাদ হলে ইংরাজী-না-জানা বাঙালী পাঠকরাও উপকৃত ...ন। আশা করি বইটির বহুল প্রচার হবে এবং রূপা কোম্পানী ভবিষ্যতে ...নের আরো বই প্রকাশ করবেন।

অমল দাশগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

মুখের মেলা ॥ মণীন্দ্র রায়। পুস্তক প্রকাশক। দেড় টাকা।

'মুখের মেলা' মণীন্দ্র রায়ের নতুন কবিতার বই। বাইশটি কবিতার ... কবিতাগুলি নানান্ ধরনের মানব-মানবীর চরিত্রের ও জীবন... চিত্র। এই ধরনের কবিতার অন্ততঃ একটা সুবিধা এই যে, কবি জী... সত্যের মালাকে সর্বদা নিজের গলায় না পরে মাঝে মাঝে অপর মা... গলায় সেটা ঝুলিয়ে দিতে পারেন। কয়েকটি মহামূল্য জীবনসত্যের ... লাল কালির ও কালো কালির দাগ দিয়ে দিয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছে।

এক মূল্য কর্মযোগ। তা তো চিরন্তন সত্য। আবার তা যুগধর্মে ... শ্রেণীধর্মের পরিবর্তনের ফলে যুগে যুগে নতুন। এই নতুন কর্মযোগের ... ইয়াসিন মিয়া বলছে, যখন শুনি তার মুখে :

> " 'যখনি অস্থির মন, জ্বালা ধরে বুকে,
> কাজে ডুবে পেয়েছি আরাম।
> এ ছাড়া আর কী আছে! আদাব'...'সালাম!' "

রাজ্যজয় নয়, যশোলাভ নয়, জপ তপ নামাজ প্রার্থনা তীর্থযাত্রা ... ডাকটিকিট কুড়োনোর নেশা নয়, চাষ...শ্রম...যা ধরণীর আলস্য ঘুচিয়ে ... তাকে সজাগ ও সচেতন করে রাখে, যার জন্যে ইয়াসিনের ... হয়েছে, সেই স্বধর্মই ইয়াসিন মিয়া পালন করেছে। তাই অবনীকে ... মণীন্দ্র রায় বলাচ্ছেন :

> "এ জীবন এত স্বচ্ছ, বাণী তার এতোই আদিম,
> অথচ মানুষ তার লিপি ভুলে যায়!"

আর এক কর্মযোগী বুড়ো লখাই সর্দার। ছবিটা তার ভালই ... তবে একটু রোমান্টিক লখাই সর্দারের শেষ কথাগুলি। "সুখিয়োরা ... নাকাড়া বাজিয়ে", কথাটি লখাই সর্দারের মুখে ঠিক মানায় নি।

...ইনট অজিত নাগ' বোধ হয় বইটির শ্রেষ্ঠ কবিতা। আকাশের চাঁদের ... সুন্দর ছবি আছে কবিতাটিতে :

> "মাঝরাতে একা
> লণ্ঠন জ্বালিয়ে চাঁদ হেঁটে পার হয়
> তারার জোনাকিজ্বলা নীল তেপান্তর—"

...রে ভ্রমণ করতে করতে শূন্যবাদী হয়ে পড়েছে অজিত নাগ। অজিত ...বলেছে :

> "যেহেতু
> সময়কে তুড়ি দিয়ে ছুটি, তাই পৃথিবী মুঠোয়
> ধরেছি, যেমন এই তরল আধার—"

...এই বলে অজিত নাগ ঝনঝন শব্দে কাচের পেয়ালা ভেঙে প্রমাণ করতে ...এই হল পৃথিবীর মানে। কবি মন্তব্য করছেন :

> "যেন অতো সহজেই জানালায় এসে ফিরে যায়,
> শত চক্ষু রাত্রির আকাশ!"

...ই ভয়ের কথা। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যবোধ ...হিতবোধ কি ক্রমেই লুপ্ত হবে? অহেতুক ভয়। অন্ততঃ সোভিয়েত ...দেখা যাচ্ছে যে, "ওই যে সুদূর নীহারিকা"-র সাধনা যতই শেষ ...দিকে এগুচ্ছে, ত'ই যেন এই বুড়ী পৃথিবীর প্রতি মানুষের নাড়ির ...শঃ বেড়েই চলেছে। বিকৃত সমাজব্যবস্থার ফলেই বেচারী অজিত ...র বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

...বুর যুক্তিতে' কবিতাটিও খুব ভাল লাগল। কত ভুল করে মানুষ, ...বার সাংঘাতিক হেরে যায়, কত ছোট হয়ে যায় নিজের কাছে ...র কাছে, ব্যর্থতাবোধ তাকে বুনো অজগরের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ...সে সব পরাজয়ের কালি মুছে দিয়ে অবশেষে তার মনুষ্যত্বের স্বাক্ষর ...তে পারে, অন্ততঃ ইতিহাসের অলিখিত খাতায়। এতেই তার মুক্তি, ...র পরমার্থ :

> " 'শিখেছি—কেবল
> আচমকা প্রবেশ আর করতালি নয়, আত্মদানে
> প্রতিমুহূর্তের বলা-না-বলার সমস্ত মহিমা
> বাঁচে শুধু চরিত্রের শেষের প্রস্থানে।' "...

...রায় যোদ্ধা, মানবদরদী ও প্রগতিশীল কবি। তাঁর মুখের মেলায়

প্রবেশপত্র পেয়েছে তেভাগাসংগ্রামে ছেলেহারানো ইয়াসিন মিয়া, হা... হাভাতে ক্ষেতমজুর রজবালি, বন্যারিক্ত চাষী শশী দাস, গরীবের ঘ... ডাক্তারবাবু, ফুটপাতের ধারে রোদে-শুয়ে-থাকা রিক্সাঅলা, হকি... পাখিঅলা, ধর্মঘটসংগ্রামের একাকিনী শহীদ শ্রীলতা সেন, মাতৃহীনা নীলু, প্রেমবঞ্চিতা নীরজা, শ্রীমান-শ্রীমতী-ও-আর-এক-শ্রীমানের ত্রিভুজ জড়ি... অমলেশ ও নামহীন চৌধুরী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদের সকলকে জড়ি... পাচ্ছি একটা বেদনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার জগৎ কিন্তু এই জগতে আছে মানুষের পরস্পরের প্রতি গভীর মমতা, তার ত্যাগ, তার ক্ষমা, তা... অপরাজেয় আত্মার দুর্জয় ও অলোকসামান্য অভিযান। মানবজীবনে... নঞর্থক দিকগুলির চেয়ে সদর্থক দিকগুলির প্রতিই মণীন্দ্র রায়ের পক্ষপাত। তার ফলে আধুনিক কবিদের প্রচলিত নীরবতার বিধিকে লঙ্ঘন করে ... আগাগোড়া বেশ বক্তব্যমুখর। কবিতাগুলি আর্ত মানব-মানবীর প্রতি গভী... সমবেদনায় রঞ্জিত, সহজ ও শুভ্র মানবপ্রেমে সুরভিত।

অবশ্য সময়ে সময়ে বক্তব্যভার বশে কোনো কোনো কবিতা একটু বেসুরো, একটু অবাস্তব ও একটু বক্তৃতাধর্মী হয়ে পড়েছে। নীলুর মুখে 'মাসি গো এবার গেছি হেরে। বড়, আরো বড় হব। দেখিস তোকে আমি তোকে।'—এই সব কথা বসিয়ে মণীন্দ্র রায় নীলুর প্রতি এবং কা... প্রতিও একটু অবিচার করেছেন। মাসীদের কাণ্ডকারখানাকে নীলু আমাদের চোখ দিয়ে দেখে না এবং ওদের নিজেদের দেখাটাই সৎ ও ম... 'অমলেশের সন্তাপ ও শান্তি' মর্মস্পর্শী; তার নৈতিক আদর্শও খুব মহ... কিন্তু কি জানি কেন, কবিতাটি আমার ভাল লাগে নি। বড় বেশী ক... বলা হয়েছে কবিতাটিতে, সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝানো হ... হয়েছে। তাছাড়া কবিতাটিতে অনেক দুর্বল লাইনও আছে, যা মণী... রায়ের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। এর তুলনায় চৌধুরী-বিলাপ কিন্তু ... সফল হয়েছে:

"এবং তখনি চোখ মেলে সে জোয়ারে টলোমলো
নৌকার মতোই ছিটকে স'রে গেল নীরব ধিক্কারে।
শুধু এক মুহূর্তের চোখের সে চাওয়া
বিদ্ধ ক'রে গেল ভূতভবিষ্যৎ।"

চৌধুরীর কাছ থেকে নীলার ছিটকে সরে যাওয়ার এই ছবিটা ম...

...সহজে মেলাতে চায় না। এই রকম অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি মণীন্দ্র রায় এঁকেছেন। ধানকাটার সময়ে জমি থেকে উৎখাত-হয়ে-যাওয়া বুড়ো ক্ষেতমজুর রজবালি স্বপ্ন দেখছে:

"আর ধমনীর স্রোতে অভীপ্সার রঙে অবিরত
দেখে—নারী নয়—ধান, ধানের পাহাড় চারিপাশে,
মাঝখানে সে রয়েছে স্থির
উচ্ছল সর্বের ক্ষেতে নেশাধরা মৌমাছির মতো।"

শ্রীলতা সেনের কাহিনীটা কিন্তু আজকের দিনে বেশ একটু অবাস্তব। কবিতাটির ভাবাবেগ বয়ঃসন্ধিকালীন। মনে হয়, যেসব মানুষ ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মণীন্দ্র রায় লিখছেন, তাদের সঙ্গে কোথায় যেন কবির একটু অসংযোগের খবর পাঠককে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ করে দিচ্ছে। নীরজার ...কথার নীতিকথাটা প্রায় ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়, অর্থাৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থই যেন একটু কথা ঘুরিয়ে বলছেন, "what man has made of woman!" এই নীতিকথা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নেই; আরো তা উচ্চারিত হোক কবিতায়, কিন্তু ঠিক জজসাহেবদের ঢঙে নয়। তাছাড়া, নীরজাকে অমলেশ, বঙ্কু ও রাজীবদের দলের কেউ ভালবাসে নি ঠিক কথা, কিন্তু নীরজাই কি কাউকে ভালবেসেছে? নীরজাদের schizophrenia-র গভীরতর সামাজিক কারণ আছে। তবে এসব কথা বলা নিশ্চয়ই খুব বেরসিকতা হয়ে যাচ্ছে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

কেরী সাহেবের মুন্সী ॥ প্রমথনাথ বিশী। মিত্র ও ঘোষ। সাড়ে আট টাকা॥

...খ্যাত ঐতিহাসিক ও মনীষী স্যর যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ...লোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সাহিত্য শ্রেণীরই ...র্গত, ইতিহাসের নয়। তিনি বলেছিলেন, যদি ঐতিহাসিক তথ্যের ...লাপ না হয় তবে ইতিহাসের ভিত্তিতে লেখা উপন্যাস সার্থক হবে যদি ...র দিক থেকে তা উত্তীর্ণ হয়। তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে ইংলণ্ডের ...বিখ্যাত সমালোচকের মন্তব্য পেশ করেছিলেন। ফলে বলা যেতে ...ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ঘটনাবলীর সঙ্গে যদি বিরোধ ও ...না ঘটে তবে তাঁদের সম্বন্ধে যুগসাপেক্ষ অন্যান্য কাল্পনিক ঘটনার

সমাবেশ ও সে যুগের ইতিহাস সম্ভাব্য কাল্পনিক ব্যক্তিকে উপস্থিত করায় উপন্যাসকার স্বাধীনহস্ত। যতটুকু ইতিহাসের প্রকৃষ্টরূপে জানা তার অতিরিক্ত ইতিহাসমুখপেক্ষিতার দাবী বা চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এই সিদ্ধান্ত থেকে বিচার করে স্যর যদুনাথ ও প্রতিষ্ঠাবান সমালোচকরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'কে বিশ্বের ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেণীর উচ্চাসনে স্থান দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, উদিপুরী বেগম, জেবউন্নিসা—ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও চরিত্রচিত্রণ যথাসম্ভব কালাপযোগী। মোগল বাদশারা রাজপুত রাজকন্যাদের হারেমে আনবার জন্য প্রয়োজন মতো বলপ্রয়োগ করতে বা যুদ্ধ অভিযানে পরাঙ্মুখ হতেন না। পর্বত রন্ধ্রে বন্দী হয়ে আওরঙ্গজেব রাজপুতদের সঙ্গে কপট সন্ধি করেছিলেন। আবার মোগল হারেমের বিলাসিতা উচ্ছৃঙ্খলতাও সুবিদিত। বাদশাহ আলমগীর মস্তাসক্তি, বেশ শৈথিল্য ও গুপ্ত প্রণয়ের জন্য স্বীয় কন্যার প্রতি বিশেষ রুষ্ট ছিলেন। ইতিহাসের এই জমিতে বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসা মবারক দরিয়ার প্রেমদংশন ও বিষোদ্গার, নির্মলকুমারীর প্রভুনিষ্ঠা ও নির্ভীক দৌত্য; চঞ্চলকুমারীর স্বদেশ গৌরব-সাধন স্পৃহা ও আলমগীরের পায়রার সাহায্যে সন্ধি ভিক্ষা ইত্যাদির যে ফুলদার বুনেছেন তা সত্যই বিশ্বসাহিত্যে অনুপম। 'সীতারাম'কেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে উচ্চস্থান দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচকরা। সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি; বিদিত আছে তিনি অতি নিষ্ঠুর অত্যাচারী ছিলেন। এ উপন্যাসেও ইতিহাসের অপলাপ হয় নি, সমালোচকরা মনে করেন। অথচ উপন্যাস হয়েছে অশেষ প্রাণস্পর্শী। আনন্দমঠের ঐতিহাসিক সারাংশ এক টুকরা লড়াই মাত্র,—সশস্ত্র একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ইংরেজ রাজের। অস্বীকার করার উপায় নেই যে আনন্দমঠের উপন্যাসত্ব প্রাণশক্তিহীন, কিন্তু আনন্দমঠ স্বদেশব্রতে দীক্ষা গ্রহণ ও 'বন্দেমাতরম' প্রস্তাবিত করে ভারতের স্বাধীনতালাভ সঙ্কল্প অগ্রসর করেছে। মৃণালিনী, দেবী চৌধুরাণী, দুর্গেশনন্দিনী ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের উপন্যাস হোল 'চন্দ্রশেখর',—কেউ কেউ মনে করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইতিহাসোক্ত ব্যক্তি এটিতে আছেন মীরকাসিম, দলনীবেগম ও গুরগনখাঁ। স্থান কাল ইতিহাস সাপেক্ষ মুঙ্গের, কাসিমবাজার, উদয়ানালার যুদ্ধ—অপ্রাকৃত নয়। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাধান্য না থাকলেও ইংরেজ কর্তৃক বাংলাদেশ জয়ের প্রাক্কালে ও পরবর্তীকালে

স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে সংস্পর্শ ঘটায় যা অনিবার্য ফল-অভ্রান্ত দৃষ্টিবলে বঙ্কিম তাকে 'চন্দ্রশেখরে' উপস্থাপিত করেছেন। স্বদেশ থেকে সুদূরে স্বজন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বিদেশী যুবকের মন প্রবাসের সুন্দরী যুবতীর দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। শৈবলিনী কিন্তু লরেন্স ফষ্টরকে প্রলুব্ধ করে নির্ভীক চিত্তে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল স্বীয় অভিষ্ট সাধন মানসে। প্রেমাস্পদ লাভের দুর্দমনীয় শক্তি শৈবলিনীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেছিল। যাকে পাওয়াতে সমাজ অন্তরায় বলে সে ডুবতে গিয়েছিল তারই আশায় সে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে কলঙ্ক ও বিপদ বরণ করতে ভ্রূক্ষেপ করে নি। অবশেষে সে তারই জন্য উন্মাদ হয়েছিল। প্রেমের জন্য সর্বত্যাগী হতে পারে বলেই এ নারী চরিত্র অপরূপ। তেমনি অপরূপ চরিত্র চন্দ্রশেখর, জ্ঞানস্পৃহা ও শাস্ত্রপাঠই যার ছিল জীবনসর্বস্ব। গভীর রাত্রে চাঁদের আলোয় অসম্বৃত বসন নিদ্রিতা যুবতী স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখে যিনি গভীর অনুতপ্ত,—অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ হবার জন্যই কি এ সৌন্দর্যময়ীকে ঘরে এনেছিলেন! জ্ঞানলিপ্সু, আত্মদর্শী এ রকম বিরল চরিত্রের উপন্যাস সাহিত্যে সাক্ষাৎ মেলা দুর্লভ। 'চন্দ্রশেখরে' ঐতিহাসিক ব্যক্তির বা ঘটনার গুরুত্ব নেই, কিন্তু সমাজ বিবর্তনে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের একটা রূপকল্প হয়েছে। সুদীর্ঘ মুসলমান যুগের অবসানে ও ইংরেজ যুগের সূত্রপাতে বাংলাদেশের নারী, সাহিত্যে, প্রথম বিদ্রোহ করেছে সমাজের বিরুদ্ধে,—একান্ত করে ভালবাসে যাকে তাকে পাবার সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন করতে।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' প্রায় অবিকল্প ইতিহাস; এর অন্তর্গত উপন্যাস-সারবত্তা লঘু। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'ও ঐ শ্রেণীর। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বৌদ্ধ ও গুপ্ত যুগের পটভূমি-সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট রচনা। আর একটি উপন্যাসের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, সে হোল 'গোরা'। গোরাতে ঐতিহাসিক ব্যক্তি নেই; সদর রাস্তা দিয়ে ইতিহাস-প্রবেশ নেই কিন্তু অলিগলি দিয়ে আছে। সিপাহী বিদ্রোহকালে বাঙালী পরিবারে আইরিশ শিশুর আশ্রয়লাভ ও জীবন গঠনের বিচিত্র কল্পনা গোরার দীপ্ত চরিত্র ও স্বাদেশিকতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। এ কল্পনা ইতিহাস-সম্ভাব্য।

রচনা দীর্ঘ হোল। অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস ইদানিং বাংলায় রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশেষ করে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক

পটভূমি উপন্যাস ফলাবার উর্বর ক্ষেত্র। এই নতুন উপন্যাসগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, "কেরী সাহেবের মুন্সী";—প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত ৪৬৩ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ উপন্যাস। এর ইতিহাস-ভাগ যেমন অনবদ্য উপন্যাস-ভাগেও তেমনি মর্মস্পর্শী অপরিসীম নিপুণতা।

ইতিহাসের যে পর্বে গ্রন্থকার কাহিনীটির ঘটস্থাপন করেছেন সে হোল ভারতের নিয়তির এক রহস্যঘন সন্ধিক্ষণ; ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩'র অন্তর্বর্তীকাল। ক্লাইভের বাংলাদেশ জয় ও হেস্টিংসের রাজ্যবিস্তার সমাপ্ত হয়েছে। ওয়েলেস্লি অল্পকালের জন্য আমীরি করে চলে গেছেন। এসেছে কর্ণওয়ালিসের যুগ। কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে, তার শতাধিক বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে, পত্তন থেকে। যেমন শহর গড়ে উঠেছে তেমনি গড়ে উঠেছে খাস বিলাতী সমাজ, ফিরিঙ্গী সমাজ, দেশী জমিদার মুচ্ছুদ্দি-বাবু-ব্যবসাদার-মজুর-দোকানীর সমাজ। পাদ্রীরা এসেছেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কাজে। মিশন গির্জা (১৭৭০), সেণ্টজন গির্জা (১৭৯২), সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজের কবরখানা বেরিয়াল রোডের পূর্বপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয়েছে। ইংলণ্ডের আদর্শে আদালত স্থাপিত হয়েছে। ইংলণ্ডে তখন অনেক আগেই শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ হয়েছে; রয়াল সোসাইটি ধর্মানুশাসিত শিক্ষা ছেড়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা নিরূপিত জ্ঞানানুশীলনের জন্য রাজকীয় অনুমোদন ও অর্থ সাহায্য লাভ করেছে। জ্ঞান জগতের পূজ্য হয়েছেন বেকন। নিউটন ওয়াটসের আবিষ্কার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ছাপাখানার প্রচলন হয়েছে। এদিকে স্যর উইলিয়ম জোন্স ও অন্যান্য ইংরেজ কর্তৃক সংস্কৃত সাহিত্য 'আবিষ্কৃত' হয়েছে। শকুন্তলা ঋতুসংহার হিতোপদেশ গীতা মনুসংহিতা অনূদিত হয়েছে। এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে (১৭৮৪ অব্দ)। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ ও বাঙালী দুই জাতি পরস্পর সম্মুখীন। এক জাতি জ্ঞান শিক্ষা বিজ্ঞান বাণিজ্য শিল্প পথে নূতন উদ্দীপনায় অগ্রণী; অপর জাতি পূর্ব জ্ঞান বিদ্যা ও শিল্প গরিমার শিখর আরোহণান্তে মূঢ় আচার ও অজ্ঞতার শবাসনে আসীন। এই দুই জাতির সংঘাত ও মিলনে যে অমৃত উঠে এলো তা হোল ইংরাজী ভাষা গণিত ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষার আদর ও সমাজ সংস্কার, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ আইন প্রতিষ্ঠা। এই মিলনের আর একটি ফল উচ্চ

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে মেলামেশা ও দেশী বিদেশী যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় ও বিবাহ। জব চার্ণক প্রায় একশ' বছর আগে যখন এক সতীকে চিতাযাত্রা থেকে উদ্ধার করে ঘরে তুলে এনে বিবাহ করেছিলেন তখনও মেলামেশার পথ প্রশস্ত হয় নি। শৈবলিনী যখন লরেন্স ফস্টরকে প্রলুব্ধ করেছিল তখনও বাংলাদেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় নি। দেশ তখনও মুসলমানের অধিকারে ও যুদ্ধবিগ্রহে বিপর্যস্ত। কর্ণওয়ালিশের সময় কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী পল্লীশহরে শান্তি ও স্বস্তির হাওয়া বইতে সুরু করেছে। দেশী বিদেশীর সামাজিক মেলামেশা সহজ হয়েছে। অপূর্ব দক্ষতায় গ্রন্থকার তাঁর কাহিনীতে নায়িকা রেশমীকে চিতা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের আশ্রয়ে স্থাপন করেছেন, যেখানে তার সঙ্গে ইংরেজ যুবক জন-এর প্রণয়ের সুযোগ সম্ভাবনা হয়।

রেশমী ইংরেজ পরিবারে স্থান পাবার আগে চিতা থেকে পালিয়ে এসে বিখ্যাত বাইবেল অনুবাদক শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরী সাহেবের নৌকায় আশ্রয় পায়। উইলিয়ম কেরী ১৭৯৩ অব্দে এদেশে আসেন ক্রিশ্চান মিশনারির কার্যভার নিয়ে। কিন্তু কোম্পানী শাসিত কলকাতায় তাঁর মিশন স্থাপনের সুযোগ না পেয়ে নানা স্থান ঘুরে তিনি শেষে ডাচ্‌দের অধীন শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপনা করেন। অবিলম্বে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য সফলকাম করতে বাংলায় বাইবেলের তর্জমা করা চাই। এই কাজের জন্য তিনি সহায় লাভ করেন রামরাম বসুর। রামরাম বসুও খ্যাতব্যক্তি। কেরীকৃত বাইবেল অনুবাদ চেষ্টার ফলে বাংলা গদ্য প্রথম প্রেরণা লাভ করে, কেননা তার আগে বাংলা গদ্যে লেখা হোত শুধু দলিলপত্রাদি। এর ওপর ছাপাখানার ব্যবহারে বাংলা গদ্য নবজন্ম লাভ করে। কেরী বাইবেল প্রচারের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। বাইবেল অনুবাদের সাহায্য ছাড়াও রামরাম বসু বাংলায় প্রতাপাদিত্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। কেরী সাহেব যেমন ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টভক্ত, রামরাম বসু তেমনি ছিলেন নাস্তিক, সাধারণ মানবিকতায় ও সচ্ছ-জীবন-ধারণ-সুখে বিশ্বাসী। গ্রন্থকার কাহিনীতে ইঙ্গিত করেছেন যে, মনে মনে সদা অসুখী শুচিবাইগ্রস্ত সম্মার্জনী প্রহারে সিদ্ধহস্ত দুর্জয় স্ত্রীর তাড়না তাঁকে ঐ পথে সম্যক ঠেলে দিয়েছিল। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির এক জায়গায় মিল ছিল, সে হোল বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চা।

কেরী—রামরাম বসুর সংযোগ যেমন ঐতিহাসিক, বইটির তেমনি অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহারাজা নবকৃষ্ণ ও রাধাকান্ত দেব। অপর দিকে সে সময়কার কলকাতার পথ ঘাট, বিভিন্ন অঞ্চল, বাড়ি, গির্জা, কবরখানা, কলকাতার উপকণ্ঠ, সুন্দরবনের সান্নিধ্য, ইংরেজ সমাজ, শিকার, ডুয়েল, নব্যবাবু সমাজ, গণিকা, বাগানবাড়ি, নাচগান, প্রবলপ্রতাপ জমিদার, মদনমোহনতলা ইত্যাদির অবিকৃত চিত্র বইটিকে অপরূপ সজীব তাজা করেছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন যে তাঁকে কাহিনীতে স্থান দেবার জন্য বয়স বাড়িয়ে দেবার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেন নি। আর একজন জ্ঞাত মহিলাকে গ্রন্থকার তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন ;—ইনি হলেন রোজ এলমার্স। এদেশে অবস্থানকালে তাঁর অকাল মৃত্যু হয় ও কলকাতায় তিনি সমাধিস্থ হন। স্বদেশস্থ এক কবির তিনি ছিলেন প্রণয়িনী। গ্রন্থকারের কাহিনীতে এঁরই সহচরীর কাজে রেশমী নিযুক্তা হন। তিনি জনকে করেছেন রোজের প্রণয়প্রার্থী কিন্তু রোজ স্বদেশের কবির প্রতিই মৃত্যুকাল পর্যন্ত একনিষ্ঠ ছিলেন। জনকে এভাবে রোজের প্রণয়প্রার্থী করায় ইতিহাসের কোন ব্যত্যয় হয় নি।

রেশমী ছিল কলকাতার কাছাকাছি গঙ্গাধারের জোড়ামউ গ্রামের মেয়ে। এক দুর্ঘটনায় ছেলেবেলায় সে বাপ-মা ভাইবোন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে দিদিমার কাছে ঐ গ্রামে। বিষয় লোভে গ্রামবাসী এক আত্মীয় চক্রান্ত করে অন্তিমকালের এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। বৃদ্ধের মৃত্যু হলে জোর করে তাকে সহমরণের চিতায় তুলতে গেলে সে সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গায়। সাঁতরে ওঠে কেরীর নৌকায়। তিনি তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন মদনাবাটিতে মিশন খুলতে। রামরাম বসু ছিলেন সহযাত্রী। রেশমী কেরী দম্পতির আশ্রয় পায়, ইংরেজী ভাষা ও আদবকায়দা শেখে। বছর দুই কেটে যায় মদনাবাড়িতে। কেরী-রামরাম বসুর বাইবেল অনুবাদ কাজ চলতে থাকে, কিন্তু মিশনের কাজ অগ্রসর হয় না। রেশমীর ইতিমধ্যে যৌবন সমাগত হয়, জানতে পারে সে অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার বলেছেন, জানতে পারে সে, দেহমন দিয়ে, আপন অন্তঃস্থলে ও পুরুষের দৃষ্টি অনুসরণ করে, যেমন করে নারী যৌবন ও আপন সৌন্দর্য-উপলব্ধি করে। রামরাম বসুরও চোখে পড়ে রেশমীর অপূর্ব সৌন্দর্য-বিকাশ যখন একদিন সন্ধ্যায় সে পূর্ণচন্দ্রালোকে স্খলিতবস্ত্র

বসেছিল এক পুকুরধারে। তিনি সংযমভ্রষ্ট হয়ে রেশমীর ঘরে যান রাত্রে, কিন্তু তার নীরব প্রত্যাখ্যান তাঁকে প্রতিরোধ করে। অতঃপর কেরীর সঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়া ভিন্ন তাঁর গত্যন্তর ছিল না, রেশমীও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসে। পথে, গঙ্গায়, জনের সঙ্গে এঁদের দেখা হলে জন রেশমীর বিবরণ অবগত হয়। ইংরেজী শিখেছে জেনে জন রেশমীকে রোজের কাছে থাকবার ব্যবস্থা করে। রোজের কাছে জনের প্রণয় নিবেদন সাড়া জাগায় না, রেশমী তা প্রত্যক্ষ করে। তার মনে জনের প্রতি অনুরাগ অঙ্কুরিত হয়। রেশমীর আকর্ষণীয় রূপ ও ব্যক্তিত্ব প্রথমটায় জনের কাছে পৌছয় না। রোজের মৃত্যু হয় অকস্মাৎ। শোকে মূঢ় জন রেশমীর অনুরাগে ধরা দেয় ও উভয়ের মধ্যে প্রণয় গাঢ় হয়ে ওঠে। অতি সুদক্ষ আর্টিস্টের তুলিতে এঁকেছেন গ্রন্থকার দেশী যুবতীর সঙ্গে বিদেশী যুবকের এই প্রেম। ইতিপূর্বে অন্য কোন উপন্যাসে দেশী বিলাতীর মধ্যে এরকম গভীর প্রেম চিত্রিত হয় নি। A Passage to Indiaতে বিলাতী নায়িকা ও দেশী নায়কের মধ্যে প্রেম হয় নি, হয়েছিল ধর্ষণভ্রম। Bhowani Junction-এ শিখ যুবকের প্রতি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান যুবতীর যে প্রেম ও বিবাহ প্রস্তাব হয় সে ভারতীয় মর্যাদা বোধের একটা ক্ষণিক উত্তেজনা। কেরী সাহেবের মুন্সীর গ্রন্থকার কিন্তু বিকশিত করেছেন নারীর চির-প্রহেলিকাময়ী আকর্ষণশক্তি, হোক তা দেশী ও বিদেশীর মধ্যে। জন যখন রেশমীর সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তখন তার প্রেমে সে বিহ্বল হয়। মিলন হয় ওষ্ঠে ওষ্ঠে, আলিঙ্গন হয় বাহুতে বাহুতে, বক্ষে বক্ষে। দুর্বার হয়ে ওঠে জনের দৈহিক মিলনাকাঙ্খা, কিন্তু ঐকান্তিক সবলে রেশমী তা প্রত্যাখ্যান করে। সে চায় নারীর প্রাপ্য সম্পূর্ণ মর্যাদা। উভয়ে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। এ বিবাহ প্রতিরোধ করতে ইংরেজ সমাজ হয় বদ্ধপরিকর, কিন্তু জন স্থিরসঙ্কল্প। আর সমাজ রেশমীর কাছে অলীক-হিন্দু আচার অর্থহীন। রেশমীর মন দেশ জাতি ও ধর্ম বিভেদের প্রাচীর লঙ্ঘন করে মানবিক প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নিয়তিচক্রে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয় ; জোড়ামউয়ের সেই আত্মীয় নৌকা করে রেশমীকে হরণ করে। সহকারী চক্রান্তের মধ্যে আছেন বাগবাজার অঞ্চলের দুর্ধর্ষ কাপ্তেনবাবু ও জমিদার মোতি রায়। তাঁর বাগানবাড়িতে নিত্যই নারীমেধ যজ্ঞ। বিপুল তাঁর প্রতাপ, অর্থবল ও নারীহরণ ব্যবস্থা। রেশমীকে হরণ করে নৌকাযোগে

নিয়ে আসার সময় অদম্য সাহসে সে আবার পলায়ন করে ও আশ্রয় পায় টুসকীর কাছে। টুসকী তারই হারানো বোন—ভাগ্য দোষে সে গণিকা ও রামরাম বসুর অনুগৃহিতা। একথা রেশমী অবশ্য তখন জানতে পারে না। টুসকীর কাছে থাকতে কিছুদিন পরে রেশমী জানতে পারে মোতি রায়ের চরেরা তাকে খুঁজে বার করবার জন্য সুযোগ পেলেই ইতঃস্তত যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এর দরুন ক্রন্দনরোল পাড়ায় ওঠে, রেশমীর কানে যায়। জনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে রেশমী মদনমোহনের বিগ্রহে চির সমর্পণের চেষ্টা করে। একদিন অন্ধকারে মদনমোহনতলায় টুসকীকে পেয়ে রেশমী ভ্রমে ধরে নিয়ে যায়, মোতি রায়ের চরেরা। জানতে পেরে ভোরেই রেশমী ছুটে যায় মোতি রায়ের বাগানবাড়িতে। বক্ষবাস উন্মোচন করে সে দাঁড়ায় তার সামনে, বলে দেখনি কি নারীর রূপ,—তবে যারে চাও, যার জন্য কত সতীর সর্বনাশ করেছ দেখ তার রূপ, তার নয়বদ ছেড়ে দাও টুসকীকে; টুসকী ছাড়া পায় ও কোন রকমে সে জনের কাছে গিয়ে পৌছয়। জন দলবল জুটিয়ে হাতিয়ার বন্দুক সংগ্রহ করে ছুটে আসে রেশমীকে উদ্ধার করতে। কিন্তু রেশমী নিজেকে বিসর্জন দেবার সঙ্কল্প করে সুযোগ পেয়ে আগুন দেয় বাড়িতে। জনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, রেশমী আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। রামরাম বসু মদনাবাটী সেই ব্যাপার থেকে রেশমীকে মানসপ্রতিমার আসনে স্থাপন করেছিলেন তার মৃত্যুতে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। একদিন গঙ্গার ধারে এ আর এক বালিকা হতভাগিনীকে চিতায় তোলা হচ্ছে দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু বিফল হয়ে নিজেও মৃত্যু মুখে পতিত হন।

রেশমীর কাহিনীটি সবিস্তারে বলা হল, কিন্তু গ্রন্থকারের দক্ষ তুলি আঁকা হয়েছে,—কেরী সাহেবের বাইবেল অনুবাদ, বাংলা অভিধান প্রণয়ন ও ছাপানো ইত্যাদি প্রচেষ্টা, রামরাম বসুর চরিত্র, ইংরেজী ও বাবু সমাজ লম্পট জমিদার, বাংলা মেয়ের গৃহস্থালি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ রাইটারদের দেশীভাষা শিক্ষা, সতীদাহ নিবারণে পণ্ডিতদের মতামত রামমোহন রায়ের সঙ্গে কথোপকথন ইত্যাদি। উপন্যাসের মূলস্রোতের সঙ্গে এগুলি নদীসঙ্গমের প্রবাহের মতো মিশে গেছে। বলা বাহুল্য সেই উপাখ্যান ও উপরোক্ত ঘটনা ও বিষয় সমাবেশ পরস্পরের এমন অপরি

পূরক হয়েছে যে রেশমীর কথা বাদ দিলে বাকিটুকু ধূলার মতো ঝড়ে পড়ত। আবার যে সময়ে রেশমীকে সংস্থাপিত করা হয়েছে সে সময় না হলে ও চরিত্র সম্ভব হোত না। 'কেরী সাহেবের মুন্সী'তে ইতিহাস উপন্যাসকে ও উপন্যাস ইতিহাসকে সমর্থন করেছে।

রেশমী উপন্যাস সাহিত্যের এক বিস্ময়কর চরিত্র। সে বুদ্ধিমতী, নির্ভীক, প্রেমে অবিকল্প ও দ্বিধাহীন, তেজস্বিনী, সঙ্কল্পনিষ্ঠ, ভগ্নী-স্ত্রীজাতি ও সতীর মর্যাদাকল্পে মৃত্যুব্রতী। উপন্যাসে গল্পে এ রকম মহীয়সী নারীর সচরাচর সাক্ষাৎলাভ হয় না। যদি ইংরেজীতে যোগ্যভাবে অনূদিত হয় ও উপযুক্ত প্রকাশকের সুদৃষ্টি লাভ করে, তবে আমার বিশ্বাস বিশ্ব সাহিত্যের যাঁরা সেরা সমালোচক তাঁদের অভিনন্দন অর্জন করবে। বাংলা ভাষায় লেখা উপন্যাস ও গল্পের যে বিশ্বসাহিত্যে যথেষ্ট সমাদর নেই, আমার মতে, সু-অনুবাদ ও সৎ-সমালোচনা ও সুযোগ্য প্রকাশকের অভাবই তার মূল কারণ। নয়ত মানবীয় মূল্যবোধের উপাদান এদেশের গল্পে ও উপন্যাসে তথা এদেশের ঐতিহ্যে ও সমাজও ভৌগলিক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট বর্তমান।

'কেরী সাহেবের মুন্সী'র আর একটি উপাদেয় বস্তু বইটির ভাষা ও স্টাইল;—নাতিদীর্ঘ বাক্যের ঋজু অনবদ্য ভাষা পুরানো কিন্তু নিজস্ব স্টাইল। স্টাইলে কিছুটা বঙ্কিমের অনুস্মৃতি আছে,—সেটুকু পরম উপভোগ্য। অধ্যায় গুলির শিরোনাম বঙ্কিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় ও অধ্যায়গুলির শেষে লেখকের মন্তব্যযোগও বঙ্কিমি ধরনের। তা হলেও লেখক এগুলিকে আত্মসাৎ ও নিজস্ব করেছেন। কোথাও কোথাও বইটিতে সস্তা শ্লেষ আছে, ও এমন কি কিছু ভাঁড়ামি, যা পরিত্যাগ করা চলত। একটি ভুল আছে, সম্ভবতঃ অনিচ্ছাকৃত;—ডুবোয় স্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছেন—Mon Chere, যা হবে Ma Chere.

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

কলকাতার কাছেই॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড। ছ টাকা॥

আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্য-বিষয়ক বইগুলি প্রতি বছরই বাংলা সাহিত্যের বাজারে কিছু না কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, কিছু না কিছু

বিতর্কেরও। আর সেই সঙ্গে সাহিত্যামোদী মহলে কিয়ৎ পরিমাণ বিভ্রান্তি যে উৎপাদিত না হয় এমন নয়। কারণ পুরস্কার যাঁরা দেন আর পুরস্কার যাঁরা পান তাঁদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র যত ঘননিবদ্ধ হোক, পাঠক বেচারা উভয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। যদিও আক্কেলসেলামি প্রায়শ তাকেই দিতে হয় কারণ পরপর কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষের দায়িত্ব অনিবার্যভাবে তার ওপরই অর্পিত হয়। পাঠক বেচারা জানে না এ বছর কোন্ সাহিত্যিকের ভাগ্যাকাশে আকাদেমি পুরস্কারের সূর্য উদিত হবে—কার পুরস্কার-প্রাপ্তির ইমারত গত কয়েক বছরের পরিচর্যায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে, তাই তার মনে একাধারে প্রত্যাশা ও আশঙ্কা লালিত হতে থাকে যা পরিশেষে প্রায়শই নিছক বিস্ময় ও বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়।

এ বছরের আকাদেমি পুরস্কার কিন্তু আগের আগের বছরগুলিকে পর্যন্ত লজ্জা দিয়েছে। এবারকার আকাদেমি পুরস্কারের সম্মান পেয়েছে গজেন্দ্র মিত্র মশাই-এর "কলকাতার কাছেই"। পুরস্কার-প্রাপ্তির আগে বইখানি পাঠের সৌভাগ্য হয়তো খুব অল্প লোকেরই হয়েছিল। কিন্তু পুরস্কার-প্রাপ্তির পর হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা কৌতূহলী হয়ে সে উপন্যাস পাঠ করেছেন। এবং বইখানি পড়ে বুদ্ধিমান সৎ পাঠকমাত্র কেবল বিচলিত, বিমূঢ়, হতচকিত ও বিভ্রান্তই বোধ করেন নি, রীতিমতো ক্ষুব্ধও হয়েছেন ; সাহিত্য বিচারকদের বুদ্ধির দীনতায় বেদনা বোধ করেছেন। এদেশে সাহিত্য বিচারের যে ন্যূনতম মান গড়ে উঠেছে তাকে পদদলিত হতে দেখলে স্বভাবতই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। কোনো ব্যক্তির আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তিতে ঈর্ষা বোধ করব এমন সংকীর্ণমনা আমরা কেউই নই—পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ লটারির টিকিটে বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রচুর অর্থ পেলে আমরা আনন্দবোধ করি ও সে আনন্দের শরিকানা দাবি করতেও দ্বিধা করি না। কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষের নামে কোনো সৃষ্টিশীল রচনাকে যখন যুগপৎ সম্মান ও অর্থদান করা হয় তখন স্বভাবতই আমরা বিচার করতে বসি—সেই রচনার দ্বারা সাহিত্য-শিল্প এবং মানবজীবন ও সমাজজীবনের কোন্ পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়েছে তা হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে উপলব্ধি করে দেখার প্রয়াস পাই। এবং যখন কোনো সদুত্তর মেলে না, যখন কোনো সমীকরণে পৌছনো সম্ভব হয় না, তখন সেই সাহিত্যকর্ম মনের মণিকোঠা থেকে নির্বাসিত হয়। সেই সঙ্গে পুরস্কারদানের সমস্ত

তাৎপর্যও অবান্তর অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, মিত্র মশাই-এর সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত ; বইখানির পর পর কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষ হতে দেখে আমরা ততোধিক গর্বিত। বাংলা বইয়ের পাঠক ও প্রচারবৃদ্ধিতে কোন্ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি গর্বিত না হবেন। কিন্তু যখনই "কলকাতার কাছেই" নামক বইখানিকে ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম বলে গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে তখন সিনিকের মতোই বলতে ইচ্ছে করে, "সব ঝুটা হ্যায়!" বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের বিচার, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছুই ঝুটা। নইলে ১৯৫৯ সালের বারো মাসে বহু উপন্যাসই তো প্রকাশিত হয়েছে—যেগুলিকে 'অ্যাভারেজ' আখ্যা দিলেও আলোচ্য উপন্যাসখানির তুলনায় যা অবশ্যই উচ্চাসন পাবার দাবি রাখে—তারা কোনো স্বীকৃতি পেল না আর বিধাতার কোন্ অদৃশ্য সংকেতে, সাহিত্যধর্মের কোন্ অলৌকিক গুণাবলীর কল্যাণে "কলকাতার কাছেই" শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের সম্মানেভূষিত হল!

গজেন্দ্র মিত্র মশাই বাংলার অন্যতম অগ্রজ সাহিত্যিক। সে হিসাবে তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। এ যাবৎ তিনি বহু উপন্যাস ও গল্প রচনা করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের অতি সাধারণ হাসি-কান্নার কথা ছড়িয়ে আছে সে সব রচনায়। অত্যন্ত নিরাভরণ ও অনাড়ম্বর তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টা। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানি গজেনবাবুরই উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কিনা তা তিনি নিজেও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

"কলকাতার কাছেই"-এর কালপরিক্রমা কোথাও স্পষ্টত উল্লিখিত হয় নি। তবে ধরে নেওয়া চলে ৫০।৬০ বছর আগের কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠ এর প্রধান বিচরণ-ক্ষেত্র। অবশ্য প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে কাল এখানে প্রায় কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করে নি। করতে পারত, তবু করে নি। দু-চারটে জিনিসপত্রের দাম, ট্রেনভাড়ার হার, শহরের ও উপকণ্ঠের মধ্যে ক্ষীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, আইনঅমান্য আন্দোলন ও শেষ দিকে জোড়াসাঁকো এলাকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানে যোগদান ইত্যাদি ইত্যাদির কচিৎ উল্লেখ পাঠককে কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। নইলে কাল কোথাও নেই—না চরিত্রে, না পরিবেশে, না তদানীন্তন সোশাল ভ্যালুর উন্মেষে।

"কলকাতার কাছেই" শ্যামা নাম্নী এক ভাগ্যহীনা নারীর জীবনবৃত্তান্ত।

সত্যি বলতে কি, একা শ্যামার জীবনের ঘটনাবৃত্তান্তই নয়, বহুলাংশে তার আত্মীয়-পরিজন, সন্তান-সন্ততির ঘটনাবৃত্তান্তও। আর সে ঘটনাবৃত্তান্ত বৃহত্তর কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত, কি উন্মোচিত, আলোকিত করতে চায় না, কেবল বিবরণ দিয়েই সে খালাস। তাই এ উপন্যাসের অকুস্থল কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও না আমরা চিনতে পারি কলকাতাকে, না তার উপকণ্ঠকে। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও তার পরবর্তীকালে কলকাতার জীবন-যন্ত্রণা সমাজেতিহাসের পাঠকমাত্রেরই সুবিদিত। সেই জীবন-যন্ত্রণার নাগপাশে আবদ্ধ ছিল কলকাতার মানুষ। কিন্তু "কলকাতার কাছেই" কলকাতার কোনো পরিচয়-চিহ্নই বহন করে না। হুতোমের ছোট ছোট নক্শায় কি টেকচাঁদ ঠাকুরের উপন্যাসে কলকাতার ও কলকাতার মানুষের যে প্রাণবন্ত চিত্র মেলে, এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে তার শতাংশের একাংশও মেলে না। "কলকাতার কাছেই" ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় বটে, কিন্তু এমন এক কাল-পরিধি ও তার মানুষকে সে তার সর্বাঙ্গে বেষ্টন করে আছে যে 'দেশ-কাল-পাত্রে'র দায় মুক্ত হতে চাইলেও তার মুক্তি নেই।

উপন্যাসের প্রারম্ভে শ্যামা লোলচর্ম জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা হয়ে উপস্থিত হয়—অত্যন্ত অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত এক বৃদ্ধা যার পশ্চাতে বিরাট জীবনেতিহাস, জীবনের পর্বে পর্বে যার রূঢ় ও প্রাণঘাতী অভিজ্ঞতার হস্তাবলেপ। তারপরই ফ্ল্যাশ পদ্ধতির কল্যাণে শ্যামা পরিণত হয় কিশোরীতে—নরেন নামক এক দায়িত্বজ্ঞানহীন অপদার্থ ও প্রায় অর্ধোন্মাদ পুজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই যার বৃহত্তর (!) জীবনের সূচনা। নরেনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অমানুষিকতার ফলে শ্যামা ভিখারিণীতে পরিণত হয়। নরেন বছরের মধ্যে এগারো মাস শ্যামাকে অসহায় অবস্থায় গ্রামে ফেলে রেখে শহরে পালিয়ে আসে। শহরে এসে কি করে তা লেখক জানান নি। কেবল বলেছেন, নরেন অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে, মাঝে-মধ্যে চুরি-চামারিও করে এবং প্রায় নিয়মিতভাবে গণিকাপল্লীতে যাতায়াত করে এবং মারাত্মক দৈহিক ব্যাধিতে ভোগে। ন-মাসে ছ-মাসে যখনই এক বেলা কি আধবেলার জন্যে গ্রামে শ্যামার কাছে যায়, নরেন শ্যামাকে মারধোর করে, তার ভাঁড়ারের যা কিছু সামান্য সম্বল ছিনিয়ে নিয়ে আসে এবং তার পৌরুষের পরিচয় দিতে কার্পণ্য করে না। ফলে শ্যামা বৎসরান্তে জননী হয়। শ্যামা মুখ বুজে পশুর মতো

সমস্ত কিছু সহ্য করে, সন্তান পালন করে এবং নিজের মা, দিদি ও অপরের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে বছরের পর বছর জীবন যাপন করে। তার মনে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, প্রতিবাদ নেই, ঘৃণা নেই। সে আশৈশব 'পতি পরম গুরু'র দীক্ষায় লালিত হয়েছে। কিন্তু তার রক্তমাংসের শরীরের যে যন্ত্রণা, তার বুভুক্ষু হৃদয়ের যে আর্তি তার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই, অতি সহজেই তার নিবৃত্তি ঘটে। শ্যামা অবলীলাক্রমে তার সন্তান-সন্ততির বিবাহ পর্যন্ত দেয়। নরেন তার খোঁজও রাখে না। আগাগোড়াই সে অমানুষ, অপদার্থ। তার কোনো পরিবর্তন নেই। মনের দিক থেকে বড়ো রকমের পরিবর্তন নেই উপন্যাসের কোনো চরিত্রেরই। প্রায় প্রতি চরিত্রই যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—তাদের উত্তরণ নেই। জায়গায় জায়গায় টুকিটাকি ঘরোয়া ছবি মনকে স্পর্শ করে বটে কিন্তু সে আর কতটুকু!

মোট কথা, "কলকাতার কাছেই" শ্যামার ও শ্যামার আত্মীয়পরিজনের মামুলী জীবনযাত্রার একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর ঘটনাবৃত্তান্ত মাত্র যা পাঠককে কিছু দেয় না, নিয়ে নেয় অনেকখানি। অর্থাৎ তার দুর্লভ সময় অপচয়িত হয়। শ্যামার কাহিনী জেনে পাঠকের কোনো লাভ নেই যদি না সে চরিত্রের মুকুরে জীবনের বা সমাজের কোনো গূঢ় বা মৌল সত্য প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। শ্যামার মতো লক্ষ লক্ষ মেয়ে বাংলার হাটেমাঠে ছড়িয়ে আছে—পথ চলতে গিয়ে কি ট্রেনে চড়তে গিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের নিত্য দেখা হয়। কিন্তু সে আর কতটুকু দেখা! "কলকাতার কাছেই" যদি তাদের জীবন-মন্থিত যন্ত্রণাকে, তাদের জীবনের গরল ও অমিয়কে শিল্পীর শিল্পলোকে তুলে আনতে পারত, তবেই সার্থক হত সে প্রচেষ্টা।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, এই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে তিনি আরও দু-একটি উপন্যাস লিখবেন। লিখুন, আপত্তি নেই। কিন্তু তারা যেন পাঠকের সময়ের অপব্যয় ঘটিয়েই বিদায় না নেয়, বিদায় নেবার আগে যেন কিছু দিয়ে যায় যা ক্ষণিকের জন্যেও পাঠকের মনকে আন্দোলিত করবে, তার বুদ্ধি ও হৃদয়কে তৃপ্ত করবে।

দিবাকর পুরকায়স্থ

প্রাণগঙ্গা ॥ অবিনাশ সাহা। ভারতী লাইব্রেরী। ছ টাকা॥
অন্তদৃষ্টি ॥ সুনীল ঘোষ। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ছ টাকা॥
অবরোহণ ॥ কণাদ গুপ্ত। কথাসাহিত্য মন্দির। আড়াই টাকা॥
বন্দরের কাল ॥ বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন। সাড়ে চার টাকা॥

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের নবজাগ্রত চর—চরফুটনগর ও ধলেশ্বরীর দক্ষিণ পাড়ের চরধল্লার বাসিন্দাদের সুখদুঃখ ও নিয়ত সংগ্রামশীলতার সনিষ্ঠ রচনা 'প্রাণগঙ্গা'। দীনু বৈরাগী এবং করিম ফকিরের প্রযত্নে জমিদার রমেন্দ্র-নারায়ণপ্রদত্ত চরফুটনগরের পত্তন, তার ক্রমোন্নতি এবং পতনের ইতিবৃত্ত এই উপন্যাসের অঙ্গীভূত। সুতরাং কাহিনীর মধ্যে ব্যাপ্তি, চরিত্রবহুলতা অনিবার্যভাবেই এসেছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ দ্বারা বৃত জীবনপ্রবাহে চরফুটনগর বিধৌত। মেহেরা-কাশেম, অশ্বিনী-পার্বতী, ময়না-নিশির পরিণয়; কীর্তনিয়া মধু, নিবারণ, পলান, নিতাই, দীনু, দুর্গার মৃত্যু; এবং এছাড়া অজস্র চরিত্রের সমাবেশে এই চর মুখর। কুসীদজীবী নিতাই ও রসিক, স্বেচ্ছাচারী লম্পট জমিদার রমেন্দ্রনারায়ণ এবং তার চাটুকার রামকান্ত, দুর্গার ভাই আনন্দ, কুচক্রী ক্ষান্তমণি, পতিব্রতা কুসুম প্রভৃতি চরিত্র আপন আপন বৈশিষ্ট্যে জীবন্ময়। বিশেষত দীনু বৈরাগী আর করিম ফকিরের হার্দ্য সরলতা, নির্বিরোধ অমায়িক স্বভাবের পরিচয় শ্রীযুক্ত সাহা যেভাবে আমাদের গোচরীভূত করেছেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। কেবলমাত্র রামকান্ত যেন কিছু পরিকল্পিত, ছাঁচে-ঢালা, নাটকীয়। ত্রুটির আরেকটি দিক উপন্যাসটির অকারণ দীর্ঘতা। একে অতগুলি কুশীলব, তেমনি ঘটনার আবর্ত, তারপরও যদি মেলা আর বিবাহ নিয়ে পাতার পর পাতা অপব্যয়িত হয় তবে সে বই মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর ঠেকেই। চরফুটনগরের কাহিনীর সঙ্গে চরধল্লার, অথবা, পলানের কাহিনী সম্পৃক্ত না হলে উপন্যাসটি সুসংহত, নাতিদীর্ঘ হতে পারত। তবু লেখকের মানবদরদী দৃষ্টিভঙ্গী, চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা এবং পাঠকহৃদয়-সম্বাদী করার জন্য যে প্রভূত নিষ্ঠার পরিচয় প্রায়শই রচনার মধ্যে অনুভব করি, সেই কারণে 'প্রাণগঙ্গা' আমাদের ভালো লাগে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও।

শ্রীযুক্ত সুনীল ঘোষের 'অন্তদৃষ্টি' একটি সুখপাঠ্য প্রেমকাহিনী।

...হিত্যিক তথা ইঞ্জিনীয়ার অশোক মিত্র এবং অনুরাধা সরকারের ব্যর্থ ...ণয় এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই দুটি চরিত্রের পারস্পরিক ...ত্মোদ্‌ঘাটন হয়েছে আমাদের কৌতূহল বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে, দ্বিধান্বিত ...তিতে। শ্রীযুক্ত ঘোষ বেশ কৌশলের সঙ্গেই, যদিচ এতে নতুন কিছুই নেই, এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। সাধারণ, গল্পবলার ধরনে, সাবলীল ...মতার সাহায্যে তিনি এই দীর্ঘায়তন বইটিকে পাঠযোগ্য করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এই পর্যন্তই। প্রচুর অবান্তর ঘটনা, চরিত্র এতে জায়গা ...ড়েছে। মেস-জীবন, পৌররাজনীতি, ইভাক্যুয়েশান, ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন —সমস্তই কতগুলো বিচ্ছিন্ন চিত্র। অর্থাৎ পটভূমি আছে, কিন্তু তা নায়ক ...র নায়িকাচরিত্রের ওপর কোনো প্রভাব রাখছে না। এছাড়া বল্টু মজুমদারের চরিত্র নিয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষ কিছু পরিশ্রম করেছেন সত্যি, তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য তিনি অনেক অনুচ্ছেদও ব্যয় করেছেন। কিন্তু সূচনাতেই তিনি যেভাবে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তা সচরাচর যুক্তিসঙ্গত নয়। বল্টু মজুমদার উপযাচক হয়ে কেন যে অশোক মিত্রের সঙ্গে আলাপিত হল বুঝতে পারছি না। দেখা গেল, 'ধারে কাছে যত মারামারি, খুনোখুনি, বোমা-বন্দুক স্টেনগান ...লভারের ঘটনা ঘটে, তা সবই নাকি সে ঘটায়।' কিন্তু এহেন একটি লোক হঠাৎ সাহিত্যিক সঙ্গলাভের জন্যই আলাপ করতে এল—ব্যাপারটা গল্পবানানোর কৌশল ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং বল্টু মজুমদারের ভূমিকা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সে-ই নায়িকার সন্ধান দিয়েছে নায়ক এবং পাঠক উভয়কেই। শেষে দেখা যাবে অনুরাধা এরই প্রতি বাগ্‌দত্তা। ...শ ছেলে হিসেবে সে যথার্থই সদাশয়, তার অবনতির জন্য দায়ী কতকগুলি ...তিমান লোকের চক্রান্ত, লেখক জানিয়েছেন। জানি মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা প্রচুর; কিন্তু কাহিনীর স্বার্থে চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে চেপে সেই বৈচিত্র্যকে কাজে লাগানো সুলভ নাটকীয়তা ছাড়া কিছু না। সংলাপ রচনায় লেখক কোথাও কোথাও অতিরিক্ত লঘুতার আশ্রয় নিয়েছেন যা বর্জনীয়। পার্শ্ব চরিত্রগুলি, আলাদা করে উপভোগ্য হয়েছে।

শ্রীযুক্ত কণাদ গুপ্তের 'অবরোহণ' নীতি ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্বে বিক্ষত একটি তেজোদৃপ্ত চরিত্রের কাহিনী। দারিদ্র্যের অতলে ডুবতে ডুবতেও ...বন শেষপর্যন্ত ন্যায় আর সত্যের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন।

'শেষপর্যন্ত' অর্থাৎ শেষদৃশ্যে বর্ণিত নীরদের মৃত্যু কিংবা হতচেতন হওয়া পর্যন্ত। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা পরিস্ফুট করতে শ্রীযুক্ত গুপ্ত কয়েকটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। এইসঙ্গে বর্তমান যুগে জীবনের উন্নতির জন্য এমনিতর নীতিবাদিতা যে অচল তার উল্লেখও অনুপমের মাধ্যমে আভাসিত। অনুপমের ধারণা, 'চারিত্রিক শুদ্ধির হোমিওপ্যাথিক ডোজে আমার কোনো উপকার হবে না; কারণ এসব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যদি একটুআধটু ফাউল খেলার প্রয়োজন হয়, তাও আমাকে করতে হবে।' এই নীতিসংক্রান্ত বাদবিসম্বাদের পাশাপাশি একটি প্রণয়োপাখ্যানও রয়েছে। কিন্তু অনুপম আর গৌরীর রোমান্সপর্ব অত্যন্ত চিরাচরিত প্রথায় পরিকল্পিত। গৌরী ধনিকদুহিতা। টেনিস খেলে, কবিতাপ্রেমিকা, সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হলেও শ্রেণীচরিত্রে নিম্ন মধ্যবিত্ত—সেইরকম একজন যুবক, অনুপমের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ। এমনকিছু অসম্ভব হয়তো নয়, তবু এদের সম্পর্কের একটা যুক্তি অথবা ইতিহাস দেখালে শ্রীযুক্ত গুপ্ত অবাস্তবতার দায় থেকে রেহাই পেতেন। তবু একটা এপিসোড মাত্র। মূল কাহিনীটি সত্যই হৃদয়স্পর্শী। নীরদের অনড় সত্যনিষ্ঠার প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ না হয়ে পারি না; এবং অনুপমের ভ্রাতৃপ্রেম ও জীবনাচরণেও আমাদের অনুমোদন সঙ্গত কারণেই বর্তমান। ভাষার মধ্যে দক্ষ লেখনীর পরিচয় প্রচ্ছন্ন থেকেছে। শ্রীযুক্ত গুপ্তের নতুনতর গ্রন্থের জন্য আমরা কৌতূহলী রইলাম।

বাংলা সাহিত্যে পটভূমির বৈচিত্র্য বিরলদৃষ্ট। পরিচিত মধ্যবিত্ত জীবনই সাহিত্যের প্রায় তিনচতুর্থাংশব্যাপী প্রতিচিত্রিত। স্বল্প অভিজ্ঞতার মূলধন সম্বল করে লেখকেরা সৃষ্টিকর্মে ব্রতী নিরুপায় হয়েই। এতে হয়তো মিথ্যাচারিতা নেই, হয়তো বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় এতেই প্রতিভাত হবে—সবই ঠিক; কিন্তু স্বাদবদলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমাদের পাঠস্পৃহা এর ফলে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বৈচিত্র্য সর্বদাই আদৃত। তাই শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যের 'বন্দরের কাল' গ্রন্থখানির মধ্যে আনন্দ পাবার উপাদান ব্যাপ্ত হয়ে আছে। খিদিরপুর ডক-এলাকার অপরিজ্ঞাত জীবনের পশ্চাৎপটে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কাহিনীকে বিধৃত করেছেন। এটিও লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তমপুরুষে বর্ণিত। জাহাজে ট্রাফিক প্রবেশনারি হয়ে কাহিনীর কথক ডক-জীবনে পদার্পণ করেছিলেন। যাঁদের সংস্পর্শে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সরস ও

করুণ বৃত্তান্ত আমাদের জানিয়েছেন। পাগল ভাদুড়ি, মিথ্যাভাষণে পটু মজাদার মিঃ লিউইস, ট্রাফিক ম্যানেজার মিঃ মৈত্র, পিওন অবিনাশ দাস, ধনিকার দালাল জোশেফ প্রভৃতি হরেকরকম চরিত্রের সমারোহ 'বন্দরের কাল'র আকর্ষণ। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের চরিত্রসৃষ্টির হাত বেশ দক্ষ, একথা স্বীকার করার মতো প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিপৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। তাছাড়া, জাহাজীজীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণাও আমাদের জন্মাল লেখকের অভিজ্ঞতাপুষ্ট এই বইটির বৈগুণ্যে। তবে কতকগুলি চরিত্রের রেখাচিত্রই এতে অসংলগ্নভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কোনো পারম্পর্যের অনুক্রমে তারা বিন্যস্ত হয় নি। লেখকের ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে একটা বক্তব্য নিবেদন করি। কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত উপমা এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ কাঁচা ভাবালুতায় আবিল তাঁর বাক্যবন্ধ বইটিকে সর্বত্র রমণীয়পাঠ্য করে নি। তবু বিষয়ের আকর্ষণ ক্ষমতা থাকায় 'বন্দরের কাল' পাঠকসমাজের নিবিষ্ট মনোযোগের পাত্র।

শিবশম্ভু পাল

বাংলা গল্প-বিচিত্রা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চার টাকা ॥

গল্প সাহিত্যে নবীন আগন্তুক, বাংলা সাহিত্যেও। নবীন হলেও অবশ্য তার সমৃদ্ধি আমাদের সাহিত্যে স্বল্প নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা গল্প নিয়ে দাঁড়াতে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ নেই—এ জাতীয় কথা আমরা শুনে এবং বলে অভ্যস্ত, কিন্তু বাংলা গল্প-সাহিত্যের যথাযথ মূল্য নিরূপণের প্রয়াস আমাদের মধ্যে বিরল। ঐ অনির্দিষ্ট ধরনের আপ্তবাক্য আমাদের মনকে যে অলস সুখের মধ্যে অভ্যস্ত করে রেখেছে, তাকে বিচারের জগতে কোনোদিন জাগাই নি, যাচাই করে দেখবার কথা বিশেষ ভাবি নি। কিন্তু সুখ আসলে মানসিক আলস্যে নয়, সুখ পূর্ণ সেখানে যেখানে সে পরীক্ষার পাহারা পেরিয়েও টিকে থাকে। আমাদের সেই অভ্যস্ত জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন বিখ্যাত কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এক দিক থেকে এ বিষয়ে বই এই প্রথম।

অবশ্য একেবারে প্রথম কিনা সে বিষয়ে ইতিহাসবিদরা প্রশ্ন তুলতে

পারেন। দশ বছর আগে ১৯৫০-এর জুলাই মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার একজন অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বাংলা ছোট গল্প—সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' (মডার্ন বুক এজেন্সী প্রকাশিত) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইয়ের 'পরিচয়' লিখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং 'মুখবন্ধ' লিখেছিলেন তদানীন্তন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বইয়ের প্রথম দিকে ছোটগল্পের সম্পর্কে তত্ত্বগত বিষয় উপস্থাপিত, আর পরের দিকে আছে উনিশ শতকের গল্প-সূচনা থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা। কিন্তু এ বইয়ের আলোচনা খুবই নিম্নস্তরের। ফলে নামকরা প্রকাশকের ঘরের বই হওয়া সত্ত্বেও এ বইয়ের স্বীকৃতি হয় নি। কিন্তু বহু পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে লেখক সূচনা-কালের গল্পের একটি বিস্তৃত তালিকা সংকলন করেছিলেন। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, উদ্বোধন, অনুসন্ধান, সাহিত্যকল্পদ্রুম, গান ও গল্প, জন্মভূমি, সাহিত্য, বীণাপাণি, ভারতী ও বালক, প্রদীপ, সুহৃদ, সুবোধিনী, নবজীবন, দাসী, বামাবোধিনী পত্রিকা, কল্পনা, আত্মদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর, পুণ্য, রহস্য-সন্দর্ভ, বাসনা, উৎসাহ প্রভৃতি কাগজ থেকে তালিকাটি করা হয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আশুতোষ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র সেন, প্রজ্ঞা দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনবিহারী রক্ষিত, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, রমণীমোহন ঘোষ, রাধামণি দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্ণকুমারী দেবী, হারানচন্দ্র রক্ষিত, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, হিরণ্ময়ী দেবী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি লেখকরা তালিকাভুক্ত ছিলেন। এবং নামাঙ্কিত নয় এমন বেওয়ারিশ গল্পের সংখ্যা ১২৬—এগুলিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এ বইয়ের, আলোচনার মূল্য যত কমই হোক, শুধু গল্প-আলোচনার প্রথম বই বলে ইতিহাসকার এর নাম করবেন, এবং এই তালিকাটির জন্য ভবিষ্যতের গবেষক বইটির খোঁজ রাখবেন। 'মুখবন্ধে' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধানত এই কথাটারই উপর জোর দিয়েছেন।

এ ছাড়া শ্রীকুমারবাবুর নিজের যে বই তা যদিও মূলত উপন্যাসের ধারা

অনুসরণে ব্যাপৃত, কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে গল্পও কিছুটা অন্তর্ভুক্ত; প্রতাপান্বিত গৃহকর্তার সাতমহলা বাড়ির এক কোণে দূর সম্পর্কের কুটুম্বের অনাদৃত উপস্থিতি যেন—স্বাতন্ত্র্যহীন, আশ্রয়দাতার বিরাট বপুর আড়ালে প্রায়-বিলীন। রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর একটি বই ছাড়াও সংক্ষিপ্ত আলোচনা একাধিক রবীন্দ্র-আলোচনা-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এর কোনোটায়ই বাংলা ছোটগল্পের সামগ্রিক আলোচনা নেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার টুকরোটাকরা প্রবন্ধ বা 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় ছোটগল্প-আলোচনায় সংহত তৎপরতার অভাব আছে।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ছোটগল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে গল্পের বই প্রকাশ করতে প্রকাশকরা ভয় পেতেন, এখন সহজে সংস্করণ নিঃশেষ হয়, 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র জনপ্রিয়তাও লক্ষণীয়। অচলায়তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ছোটগল্পকে একটি বিশেষ পত্রের অর্ধাংশে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া শুধুমাত্র ছোটগল্পের পত্রিকাও ইদানীং প্রকাশিত হচ্ছে। অভাব শুধু গল্প-আলোচনা-গ্রন্থের। অবশ্য পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে এদের পরোক্ষ দাবিতেই আলোচনাও লিখিত হবে।

এই পটভূমিকায় সর্বপ্রথম দেখা দিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোট গল্প' ১৩৬৩-এর শ্রাবণে। এ বইয়ের ক্ষীণ দেহে দ্রুত হাতের ছাপ ছিল স্পষ্ট। সে ত্রুটি মুছে পূর্ণতর রূপ তিনি দিয়েছেন দ্বিতীয় সংস্করণে। বিশ্বের গল্পসাহিত্যের পটভূমিকায় ছোটগল্পের তত্ত্বগত বিষয় এ গ্রন্থের উপজীব্য। 'বাংলা গল্প-বিচিত্রা' এর পরে স্বভাবতই প্রত্যাশিত গ্রন্থ। এতে আছে সাতজন গল্পকারের গল্প-সাহিত্যের আলোচনা। যদিও এটি ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, তবু বাংলা গল্পের প্রধান মহারথীদের অন্তর্ভুক্তিতে গ্রন্থখানি মূল্যবান। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিম্নমানের বইখানি বাদ দিলে শুধু ছোটগল্পের ওপর বই এই প্রথম।

তাছাড়া আর একটি কারণেও বইটি উল্লেখযোগ্য। নারায়ণবাবু নিজেও একজন কৃতী গল্পলেখক। 'ব্যর্থ লেখকরাই সমালোচকে পরিণত হয়'—এই প্রবাদ অন্তত নারায়ণবাবু সম্পর্কে সত্য নয়! একজন শিল্পী কর্তৃক তাঁরই আচরিত শিল্পের বিচার নিঃসন্দেহে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। নিছক-সমালোচক একটা স্তর পর্যন্ত এসে ঠেকে যেতে পারেন, কারণ তাঁকে বাইরে থেকে জিনিসটা ভেতরে নিতে হয়। আর যিনি শিল্পী তিনি তাঁর নিজের ভেতরেই

গভীর অভিজ্ঞতার অধিকারী। নিছক-সমালোচক যেখানে শাস্ত্রের বাঁধা রাস্তায় চলেন, শিল্পী-সমালোচক সেখানে অভিজ্ঞতার আলোয় পথ দেখতে পান। নিছক-সমালোচক রসজ্ঞ হলে সৌন্দর্যকে চিনতে পারেন, কিন্তু শিল্পী-সমালোচক সৌন্দর্যের জন্মরহস্যকে পর্যন্ত জানেন, তিনি তার জন্ম-যন্ত্রণাকে স্বয়ং ধারণ করেছেন, তাঁর বত্রিশ নাড়িতে তার যোগ। তাই তাঁর মাধ্যমে সৌন্দর্যের শুধু বহিরঙ্গ নয় অন্তরঙ্গ-আস্বাদনের অধিকার পাঠকের অনেক বেশী বেড়ে যায়। যে-সমালোচক যতখানি শিল্পী তত তিনি পূর্ণতর সমালোচক। বাংলাদেশে নারায়ণবাবুর প্রধান পরিচয় শিল্পী হিসেবে। সমালোচক তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়। এই বইতে তাঁর সেই দ্বিতীয় সত্তাই এসেছে সামনে। কিন্তু যে-পরিচয় তাঁর প্রধান তাকে অস্বীকার করে আসে নি, তার প্রেরণায় ও সহযোগে এসেছে। সারা বইতে এর দৃষ্টান্ত মিলবে। একটি করে অধ্যায় তিনি বেঁটে দিয়েছেন এক একজন লেখককে। গল্পকারের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই অধ্যায়ের নাম। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধ্যায়ের নাম 'রঙ্গ ও রূপক', প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের অধ্যায়ের পরিচয় 'সহজ সুরে সহজ কথা', পরশুরাম-অধ্যায় চিহ্নিত 'শরতের মেঘে বজ্র' নামে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মূল সুর 'দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী', তারাশঙ্কর-অধ্যায়ের নাম 'পশু, প্রেম, ধ্রুবতারা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিহ্নিত 'শিল্পীর দ্বিতীয় জন্ম' নামে, বিভূতিভূষণ পেয়েছেন 'ধানের শিষ ও শিশিরবিন্দু'। একটি নামের মধ্যে কোনো লেখককেই হয়তো পুরোপুরি ধারণ করা যায় না। কিন্তু শিল্পী-সমালোচক ভেঙে-কেটে বিশ্লেষণ করে গল্পকারদের উপাদান-বৈচিত্র্যকে সন্ধান করেন নি, বরং তাদের প্রাণ-ভার কোন্ বিশেষ বিন্দুর উপর মূলত ন্যস্ত, তাই খুঁজে দেখেছেন; এবং সেই মূলবিন্দুটিকেই ভাষার পরিচ্ছদে দৃষ্টিগোচর করাবার উপায় ঐ অধ্যায়-নাম। আমরা জানি, কোনো নাম, কোনো শব্দই তো একটি জীবন্ত প্রাণকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ নাম বা শব্দ মাত্রই অর্থ দ্বারা বদ্ধ সীমিত, মৃত। কিন্তু কবি যেমন শব্দকে চিরাচরিত অর্থের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তার মধ্যে প্রাণের দীপ্তি সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, নারায়ণবাবু অধ্যায়-নামে সেই চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি নামের সার্থকতা নিশ্চয়ই সমান নয়, তবু শিল্পী-সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝার দিক থেকে এগুলি লক্ষণীয়।

দুর্ভাগ্য-হত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকে একটি তুলির আঁচড়ে তিনি এঁকেছেন এই ভাবে :

"রোমান সৈন্য সিরাকিউজ অধিকার করবার সময় যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল—সেই নরমেধের বর্বরতম বলি হলেন পৃথিবীর সর্বনন্দিত অঙ্কবিৎ আর্কিমিডিস্। ঘাতক তাঁর ঘরে ঢুকেছে—কিন্তু আর্কিমিডিস্ তখনও তাঁর জ্যামিতিক রেখার মধ্যে নিমগ্নচিত্ত। বুকের সামনে উদ্যত তলোয়ার দেখেও তিনি কেবল বিরক্তিভরে বলেছিলেন, 'Don't disturb my circles'.

"মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য ও উপেক্ষার ঘাতকের কাছেই আত্মবলি দিয়েছেন। কিন্তু তখনও আর্কিমিডিসের মতোই নিজের সত্যে অবিচল থেকে বলেছেন—Don't disturb my circles."

এ বর্ণনা শিল্পীর কলম ছাড়া বেরত না।

এই সব টুকরো টুকরো উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আদ্যন্ত প্রবাহিত আছে শিল্পীসম্ভব আর একটি জিনিস—নারায়ণবাবুর বহু-প্রশংসিত ভাষা।

ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের কাছে কিছুটা বিস্মৃত হয়ে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ, এবং পুনর্মুদ্রিত বইয়ের ভূমিকায় তাঁর সমালোচনা ত্রৈলোক্যনাথকে আবার আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। নারায়ণবাবু এই পথেই আর এক পদ অগ্রসর ; ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁকে আমাদের কাছে আরো সহজগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। এ কাজের প্রয়োজন ছিল, কারণ তাঁর বিশেষত্বকে না বুঝে, তাঁর গল্পের সঙ্গে বাংলার লোক-চালিত গল্পের যোগসূত্রকে চোখের সামনে না রাখলে তাঁর পুরাতন আঙ্গিকে লেখা উদ্ভট বিষয় একালের পক্ষে রুচিকর হওয়া দুষ্কর। এ কাজ প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ লেখকরা শুরু করেছিলেন, নারায়ণবাবু তা আর এক ধাপ অগ্রসর করিয়ে দিলেন।

প্রভাতকুমার ত্রৈলোক্যনাথের মতো বিস্মৃত না হলেও একালে স্বল্প-পঠিত। তাঁর জটিলতাহীন সরস মধুর স্বচ্ছন্দ গল্পগুলির মূল্য আজকের জটিল যুগে শূন্য তো নয়ই, হয়তো একটা স্তর পর্যন্ত উপাদেয়ই। তাঁর সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যের স্বাদ ন্যূন নয়।

পরশুরাম যতটা প্রশংসিত, ততটা আলোচিত নন। সুতরাং তাঁর কৃতিত্বের কথা স্মরণ রেখেও হয়তো একথা বলার দরকার ছিল যে তাঁর

প্রথম যুগের গল্পের রসোজ্জ্বলতা পরবর্তী যুগে হ্রাস পেয়েছে এবং সমাজ-সমালোচনাও অনেক ক্ষেত্রে গল্পকে গুরুভার করে লঘুরসপ্রবাহকে ক্ষুণ্ণ করেছে। গুরুবাদের দেশে এ কথাও হয়তো বলা দরকার যে তাঁর সমাজ-চিন্তাও (বিশেষত পরের যুগের) তর্কাতীত নয়।

প্রেমেন্দ্র ও তারাশঙ্কর এ গ্রন্থে স্বল্প-আলোচিত, কিন্তু আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্যে প্রেমেন্দ্রের বিশেষ একটি অগ্রণী-ভূমিকা আছে বলেই তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কাম্য ; এবং তারাশঙ্করের সাহিত্যের মূল কয়েকটি সূত্রের স্বষ্ঠু পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে তারাশঙ্কর কিছুটা জটিল বলেই বিস্তৃততর আলোচনার দাবি রাখেন।

বিভিন্ন যুগের মধ্যে দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিরাম জীবন-সন্ধানী যাত্রার বিবরণ ও বিশ্লেষণ অতৃপ্তিকরভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও স্বচ্ছ। বিভূতি-ভূষণের গল্পে তাঁর মানসিকতা যেভাবে প্রতিভাত তার পরিচয় নারায়ণবাবু খুবই ভালভাবে দিয়েছেন।

কিন্তু নারায়ণবাবুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা বেশী বলেই এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

প্রথমত, বিচ্ছিন্নভাবে সাতজনকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বইটিকে সাতটি আলাদা-আলাদা প্রবন্ধের সমষ্টি বলে মনে হয়। অবশ্য তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন, "প্রাচীন, প্রবীণ এবং আধুনিক সাতজন কথা-সাহিত্যিকের উপর ভিত্তি করে বাংলা ছোটগল্পের রূপবৈচিত্র্য বইখানিতে দেখাবার চেষ্টা করেছি। মাত্র এই সাতজনই যে বাঙালী গল্প-লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করেন আমার বক্তব্য কখনোই তা নয়। সাতজনকে নিয়ে আলোচনা করেছি, এইটুকুই আমার কৈফিয়ৎ।" কিন্তু এ কৈফিয়ত সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ অতৃপ্তি থেকে যায়। ইতিহাস-ধারার প্রসঙ্গটা বাদ দিলেও স্বতন্ত্র লেখকদের প্রত্যেকের বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকাটি কী তার আলোচনা আরো পূর্ণতার দাবি রাখে। দু-এক জনের ক্ষেত্রে সে-দাবি কিছুটা মেটে, সবার ক্ষেত্রে নয়।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের স্বতন্ত্র গ্রন্থের পরিকল্পনা আছে কিনা জানি না, কিন্তু রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে গ্রন্থের অঙ্গহানি করেছে।

যাই হোক, এ কথাগুলি হয়তো লেখক নিজেও ভেবেছেন, এবং তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' যেমন দ্বিতীয় সংস্করণে জন্মান্তর গ্রহণ করেছে, তেমনি 'বাংলা-গল্প-বিচিত্রা'ও দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণতর হবে, এই প্রত্যাশা করব।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

পত্রিকা প্রসঙ্গ

বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা ॥ ৬০শ সংখ্যা, ১৩৬৬-৬৭। সম্পাদক : করুণাসিন্ধু দে। সাহিত্য সমিতি, বঙ্গবাসী কলেজ ছাত্রসংসদ ॥

বঙ্গবাসী কলেজ ছাত্রসংসদ প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকাটি অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কারণ সমকালীন ছাত্রসমাজের চিন্তা ও প্রয়াসের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা পত্রিকায় লক্ষ্য করা গেছে। বাংলা, ইংরিজি ও হিন্দি মোট তিনটি বিভাগে অধিকাংশ রচনাই ছাত্রদের। বাংলা বিভাগে তিনজন প্রাক্তন ছাত্রের কবিতা, তিনজন অধ্যাপকের প্রবন্ধ ও ইংরিজি বিভাগে চারজন অধ্যাপকের চারটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ এবং পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রন-পারিপাট্য সত্যই প্রশংসনীয়।

'কান্নার স্বরলিপি' নামে একাঙ্কিকাটি প্রকাশ করে সম্পাদক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি বাংলা গল্পে যে এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি গল্পেই সামগ্রিকভাবে তার দোষ ও গুণ বর্তেছে। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎকুমার দে রায়, করুণাসিন্ধু দে প্রভৃতির কবিতা সুন্দর হয়েছে। প্রবন্ধ বিভাগটি আমাদের আশা সম্পূর্ণ মেটাতে পারে নি। 'সঙ্গীত, তিন শিল্পী ও দেশপ্রেম' এবং 'প্রতিভা'—প্রবন্ধ দুটিতে চিন্তার খোরাক আছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখাটি সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ।

ইংরিজি বিভাগে পার্থপ্রতিম মৈত্র ও জগদীশ সিংহের প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য।

কলেজ পত্রিকাগুলির কাছে আমাদের আশা কম নয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের বোধ ও বিশ্লেষণ আরো নির্বাচিত, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হলে সকলের পক্ষেই আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে।

কজ্জল সেন

সংস্কৃতি-সংবাদ

শিল্পীর স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তি

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষে আবার ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর সমস্ত পৃথিবীকে উদ্দীপ্ত করেছে। পঞ্চম রিপাবলিকও যে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে না, এ-তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ-মাত্রেরই জানা ছিল।

প্রবল প্রতাপান্বিত দ্য গল ও তাঁর সভাপণ্ডিত আঁদ্রে মাল্‌রো এবং ফ্রান্সের ক্ষয়িষ্ণু, বিকারগ্রস্ত সভ্যতার অন্যান্য মনসবদাররা যখন গর্জন ও আক্রোশে 'পরশুরাম' বিরচিত 'জাবালি' গল্পের সেই বালখিল্য মুনিদের মতো দিশেহারা, তখন পঞ্চম রিপাবলিকের শুদ্ধ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক চৈতন্য সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অবিচলিত। কারণ ফরাসী বিপ্লবের মহান উত্তরাধিকার এবং বিশ-শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে ক্রমে উপনিবেশবাদের অবলুপ্তি, সমাজতন্ত্রের বিশ্ববিজয় ও গণতন্ত্রের মহিমান্বিত রূপ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ হিসেবে সেই শুদ্ধ চৈতন্যকে নিরন্তন প্রহরায় রেখেছে, নিষ্কলুষ করেছে।

তাই লাতিন আমেরিকায় সীমন দ্য ব্যেভোয়া সহ বক্তৃতাভ্রমণে বহির্গত হয়ে জাঁ পল সার্ত্র আলজীরিয় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত 'জাঁ-সঁ নেটওয়ার্ক'-এর ওপর ('ড্রেফাস-বিচার'-এর সঙ্গে যার সাদৃশ্য অনেক) এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্পের আবেগ বা 'দেশদ্রোহী'-অপবাদ তাঁর কণ্ঠকে একবারও দ্বিধান্বিত করে নি।

সার্ত্রের ঘোষণা

> তাই আবার বলছি, (আলজেরিয়ার) এই স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। যা নিশ্চিত নয়, তা হল ফ্রান্সে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। কারণ আলজীরিয় যুদ্ধ এই দেশকে কলুষিত করেছে।

সার্ত্র ফ্রান্সের বর্তমান অবস্থাকে ফাসীবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন

...জেরিয়া ও ফ্রান্সের স্বাধীনতার শত্রু অভিন্ন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ...রণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় কোন আপাত পার্থক্য নেই। ...বুদ্ধিজীবীদের জন্য তিনি কোন তথাকথিত মহৎ অথবা সাধারণ ও তুচ্ছ ...র্তব্যের ভেদাভেদে বিশ্বাসী নন।

> প্রতিরোধের সময় সর্বত্র অধ্যাপকরা যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব বা বার্তাবহর কাজ করতে কুণ্ঠিত হন নি। যদি জাঁ-সঁ আলজীরিয় সংগ্রামীদের জন্য আমাকে স্যুটকেশ বইতে কি তাঁদের আশ্রয় দিতে বলতেন এবং যদি তাঁদের বিপদে না ফেলে এটুকু করতে পারতাম, তবে বিনা দ্বিধায় তা আমি নিশ্চয়ই করতাম।

এই তথাকথিত দেশদ্রোহী লেখক ও চিন্তানায়ক সম্পর্কে সেই সব ...রাজনীতি-ভীত', 'বিশুদ্ধ শিল্পবাদী' এবং 'ব্যক্তি ও শিল্পের স্বাধীনতা-যোদ্ধা'-র ...কি বলেন আমরা তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করব।

কারণ অধুনা এক ধরনের ছদ্ম-বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করেছি, যারা নিজেদের বিকারগ্রস্ত মনের ছাঁচে ডস্টয়েভস্কি, সার্ত্র প্রমুখকে ফেলে ...র মুক্তির খেলায় অত্যাশ্চর্য কসরৎ দেখাচ্ছেন।

ঔপনিবেশিকতার অবসান এবং মানুষের স্বাধীনতা—এই দুটি অত্যন্ত ...রোচক, বাস্তব ও ধ্রুব বিষয় সম্পর্কে সার্ত্র এবং ফ্রান্সের একশো কুড়িজন বুদ্ধি-জীবীর ঐতিহাসিক ঘোষণার তাৎপর্য আমাদের পক্ষে তখনই বোঝা সহজ হবে, ...ন আমরা লক্ষ্য করতে পারব এদেশের 'ফ্রীডম অব কালচার' লীগ এবং ...দের সমর্থক কোন কোন বুদ্ধিজীবী (যাঁরা আশ্চর্য সব কারণে ...টেটসম্যান'-এর চিঠিপত্র বিভাগ এবং 'কবিতা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায়ই ...নু লিখে থাকেন) এ সম্পর্কে কি অমোঘভাবে ফ্রীডম-ভীত। সন্দেহ থাকে ... সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁদের বৃত্তি নাইটিংগেলের তো নয়ই, এমন কি মধু-...কারও নয়, নিতান্তই মাছির। যদিচ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের তথাকথিত ...সাহিত্য সম্পর্কে এঁদের প্রায়শ হাঁপানির অসুখ দেখা গেছে।

...হাসিক দলিল

...ল সরকারের ভ্রূকুটি ও দমননীতি উপেক্ষা করে ফ্রান্সে একশো একুশজন ...জীবী আলজীরিয় মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে যে ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র জারী ...রেছেন, যা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হলেও ফ্রান্সের দিকে দিকে বিলি হচ্ছে,

পঞ্চম রিপাবলিকের ডিক্টেটরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাতে আরও নতুন নতুন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সংগৃহীত হচ্ছে—সেই ঘোষণাপত্রের শেষাংশে স্পষ্টভাষায় লেখা হয়েছে :

> "আলজীরিয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অস্বীকৃতি আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি, যুক্তিসঙ্গত মনে করি।
>
> যে সকল ফরাসী নরনারী ফরাসী জাতির নামে নির্যাতিত আলজেরিয়াবাসীদের সাহায্য ও আশ্রয় দান কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন, তাঁদের আচরণ আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি, যুক্তিসঙ্গত মনে করি।
>
> ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আলজীরিয় জনসাধারণের যে আন্দোলন, সে-আন্দোলন পৃথিবীর সকল স্বাধীন মানুষের আন্দোলন।"

বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী অংশ হিসেবে আমরাও পৃথিবীর স্বাধীন মানুষের এই আন্দোলনে নিজেদের অংশ-দার করছি। আমরা বিশ্বাস রাখি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর সমর্থন অতীতের মতো আজও মানুষের পক্ষে, মুক্তির পক্ষে, অগ্রগতির পক্ষে। ব্যক্তি-স্বার্থ বা ভ্রান্ত-চেতনার মোহে বন্দী যে স্বল্প-সংখ্যক বুদ্ধিজীবী জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মনুষ্যত্বের শত্রুতা করছেন, প্রায়শ্চিত্তের এই-এক সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। মানুষের মুক্তি ও শিল্পীর স্বাধীনতা—দুয়ের মধ্যে যে কোন আত্যন্তিক বিরোধ নেই—সে কথা বোঝার দিন এসেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁরা করেন কিনা দেশবাসী সাগ্রহে তা লক্ষ্য করবেন। কারণ কে না জানে ইতিহাস বড় নির্মম বিচারক।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়




অগ্রহায়ণ
১৩৬৭
পরিচয়